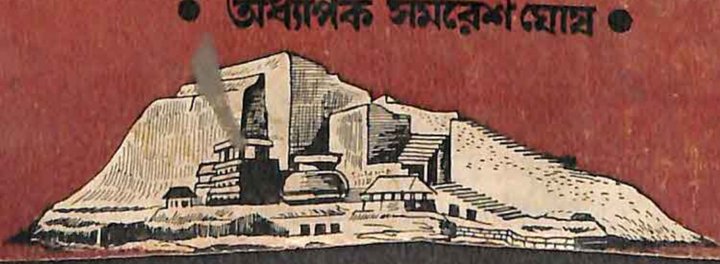






সভ্যতার রূপান্তর

• অধ্যাপক সমরেশ ঘোষ •



Recommended by the West Bengal Board of Secondary
Education as a Text-book **for Class VII.**
Vide Notification No. TB/VII/H/81/90, Dated 8. 1. 81.

সভ্যতার রূপান্তর

(মধ্য যুগ)

[সপ্তম শ্রেণীর পাঠ্য]

অধ্যাপক সমরেশ ঘোষ এম. এ.
ইতিহাস বিভাগীয়-প্রধান
প্রভু জগদ্বন্ধু কলেজ,
আন্দুল মৌড়ী, হাওড়া।

দেব সাহিত্য কুটীর

প্রকাশ করেছেন—
শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড
২১, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা—৯

জানুয়ারী
১৯৮১

ছেপেছেন—
বি. সি. মজুমদার
দেব-প্রেস
২৪, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা—৯

মূল্য—
টা. ৫'৭০

সূচীপত্র

সভ্যতার রূপান্তর

প্রথম অধ্যায়

"মধ্য যুগে"র অর্থ

তোমরা নিশ্চয়ই জান যে অতীতের বিবরণকে বলে ইতিহাস। পণ্ডিতগণ সেই ইতিহাসের ধারাকে প্রাচীন যুগ, মধ্য যুগ এবং আধুনিক যুগ—এই তিন ভাগে ভাগ করেছেন। এখন আমাদের পাঠের বিষয়বস্তু মধ্য যুগের (পৃথিবীর) ইতিহাস। মধ্য যুগ (Mediaeval) বলতে কি বুঝায়।

মধ্য যুগের অর্থ :—পৃথিবীর ইতিহাসের একটি বিশেষ অংশকে 'মধ্য যুগ" হিসেবে চিহ্নিত করার পিছনে কোন যুক্তি (logic) নাই; কারণ একটি বিশেষ দিনে বা সময়ে একটি যুগের শেষ আর অন্য একটি যুগ শুরু হয় না। ইতিহাসের ধারায় ধীরে ধীরে পরিবর্তন আসে। কিন্তু ইতিহাস পাঠের সুবিধার জন্য ঐ ভাবে চিহ্নিত করা হয়।

মধ্য যুগের অধিবাসীরা নিজেদের সময়কে মধ্য যুগ বলে মনে করত না—কারণ তাদের কাছে ঐ যুগ ছিল বর্তমান যুগ। মধ্য যুগ বলে পৃথিবীর ইতিহাসের একটি যুগকে সর্বপ্রথম চিহ্নিত করেন নবজাগরণের যুগের পণ্ডিতগণ। নবজাগরণের যুগে গ্রীক্-রোমক সভ্যতা ও সংস্কৃতির চর্চা পুনরায় শুরু হয়। ঐ সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাবে প্রভাবিত পণ্ডিতগণ পূর্বের সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে হেয় জ্ঞান করেন।

পণ্ডিতগণ পঞ্চম শতক থেকে ষোড়শ শতকের মধ্যবর্তী সময়কে 'মধ্য যুগ' হিসেবে চিহ্নিত করার পক্ষপাতী। ঐ সময়ের রাজনৈতিক আর সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য আছে। মধ্য যুগকে 'যুগ সন্ধিক্ষণ' বলা চলে।

পৃথিবীর সর্বত্র একই সময়ে মধ্য যুগের সূচনা হয় নি। ইওরোপে 'বর্বর' জাতিসমূহের আক্রমণের ফলে পঞ্চম শতকের শেষে রোমক সাম্রাজ্যের পতনের সময় থেকে মধ্য যুগের সূচনা বলে একদল পণ্ডিত মনে করেন। তাঁদের মতে ষোড়শ শতকে যখন ইওরোপের সমাজ ব্যবস্থা, রাষ্ট্র ব্যবস্থা, শিক্ষা ব্যবস্থা আর অর্থনৈতিক অবস্থায় বিরাট পরিবর্তন আসে তখনই মধ্য যুগের শেষ আর আধুনিক যুগের সূত্রপাত হয়।

ইওরোপে মধ্য যুগের প্রথম দিকে বর্বর জাতিসমূহের আক্রমণের ফলে চরম বিশৃঙ্খলা আর অরাজকতা দেখা দেয়। কিন্তু মধ্য যুগের শেষ দিকের চিত্র ভিন্ন। ঐ সময়ে প্রাচ্যের সাথে যোগাযোগের ফলে ইওরোপ আবার গ্রীক-রোমক সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসে আর তার ভিত্তিতে নতুন উন্নত সভ্যতা গড়ে তোলে। নতুন সমাজ গড়ে ওঠে, ঐ সমাজে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ছিল প্রধান বৈশিষ্ট্য। শিল্প-বাণিজ্যের প্রসারের ফলেই ঐ সমাজের উৎপত্তি আর সামন্ততন্ত্রের পতন শুরু হয়।

মধ্য যুগের শেষ দিকে রাষ্ট্রব্যবস্থায়ও পরিবর্তন আসে। ইওরোপের নানা অংশে শক্তিশালী রাজবংশ আর জাতীয় রাষ্ট্রের (Nation-States) সৃষ্টি হয়। মধ্য যুগের খ্রীস্ট ধর্মজগতের ধারণার অবসান হয়।

মধ্য যুগের শেষে শিক্ষা ব্যবস্থায়ও পরিবর্তন দেখা দেয়। গ্রীক-রোমক সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে নতুন করে পরিচয়ের ফলে মানুষের মধ্যে যুক্তিবাদ, স্বাধীন চিন্তাধারার উন্মেষ হয়। ঐ সময়ে প্রকৃতি বিজ্ঞান আর মাতৃভাষায় লেখা সাহিত্যের অভাবনীয় উন্নতি হয়। দর্শন, অঙ্কশাস্ত্র আর বিজ্ঞানচর্চার দিকে মানুষ আকৃষ্ট হয়। বহু নতুন নতুন আবিষ্কার বিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করে। মানুষের জীবনযাত্রা হয়ে ওঠে সহজ আর উন্নত।

মধ্য যুগের শেষে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও পরিবর্তন আসে। মধ্য যুগে ছিল কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি; কিন্তু ঐ যুগের শেষে

ব্যবসা-বাণিজ্যের বিশেষ উন্নতি হয়। ব্যবসা-বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে বহু শহর গড়ে ওঠে। কালক্রমে শহরগুলো হয়ে ওঠে সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র।

ভারতে মধ্য যুগের সূচনা হয়েছিল গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পরে অর্থাৎ ষষ্ঠ শতকে। ইওরোপে যেমন বর্বর জাতিসমূহের আক্রমণের ফলে দেখা দেয় বিশৃঙ্খলা, ভারতেও হুণ নামে বিদেশী জাতির আক্রমণের ফলে বিশাল গুপ্ত-সাম্রাজ্য ভেঙ্গে পড়ে। রাজনৈতিক ঐক্য নষ্ট হয়। বিদেশীয়গণ ভারতের জনসমাজে মিলে যায়।

গুপ্ত বংশের পতনের পরে ভারতে মধ্য যুগের সূচনা হলেও খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতক থেকেই মধ্য যুগের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য সামন্তপ্রথার অস্তিত্ব দেখা যায়। অবশ্য ষষ্ঠ শতক থেকেই সমাজে কৃষকের গুরুত্ব অনুভূত হতে থাকে।

কি ইউরোপে কি এশিয়ায় মধ্য যুগ বলতে পঞ্চম থেকে ষোড়শ শতকের মধ্যবর্তী সময়কে বোঝায়। কিন্তু দুই স্থানে মধ্য যুগের চিত্র ছিল ভিন্ন। ইওরোপে বর্বর জাতিসমূহের আক্রমণের ফলে গ্রীক-রোমক সভ্যতা নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু মধ্য এশিয়া, চীন, ভারত প্রভৃতি দেশে উন্নত সভ্যতা নষ্ট হয় নি। উন্নত সভ্যতার রূপে পরিবর্তন করা হয়েছিল।

ইওরোপে পঞ্চদশ শতকের শেষ আর ষোড়শ শতকের সূচনায় যে নবজাগরণ দেখা দেয় তার সাথে সাথে মধ্য যুগের অজ্ঞতা, কুসংস্কার, রক্ষণশীল মনোভাবের অবসান হয়। কিন্তু প্রাচ্যের দেশগুলিতে আরও কিছুকাল মধ্য যুগের অস্তিত্ব থাকে। কিন্তু ঐ সময়েও শিল্পের উন্নতি হয়, বিভিন্ন সংস্কৃতি আর ভাবধারার মিলন চলতে থাকে। এর আগে আরব সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রসার ইওরোপের জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে তোলে। ভারতে ঐ সময়ে রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চলে, সংস্কৃতি সমৃদ্ধ হয়। কিন্তু পশ্চিম ইওরোপে মধ্য যুগের অবসানের বেশ কিছুকাল

পরেও ভারত তথা এশিয়ায় 'মধ্য যুগ' বজায় থাকে। সুতরাং মধ্য যুগে সারা পৃথিবীতে আমরা একই ধরণের সভ্যতা, সংস্কৃতি বা প্রগতির ছবি দেখি না—এক এক প্রান্তে এক এক রূপ পরিবর্তন দেখা যায়।

অনুশীলনী

(ক) ১। 'মধ্য যুগ' কথার অর্থ কি ?

২। পণ্ডিতেরা কোন্ সময়কে 'মধ্য যুগ' রূপে চিহ্নিত করার পক্ষপাতী ?

৩। মধ্য যুগের শেষ ভাগে যে পরিবর্তন হয় তার উল্লেখ কর।

৪। ভারতে মধ্য যুগের সূচনা কাল সম্পর্কে আলোচনা কর।

৫। ইওরোপে কি কারণে মধ্য যুগের অবসান ঘটে ?

(খ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১। কোন্ অবস্থায় ইওরোপে মধ্য যুগের শুরু আর শেষ হয় ?

২। মধ্য যুগের শেষে রাষ্ট্র ব্যবস্থায় যে পরিবর্তন আসে তার উল্লেখ কর।

৩। মধ্য যুগের শেষে অর্থনৈতিক অবস্থার যে পরিবর্তন আসে সে সম্পর্কে আলোচনা কর।

৪। ইওরোপে নবজাগরণের প্রভাব কি ছিল ?

৫। পৃথিবীর সর্বত্র কি মধ্য যুগের একই রূপ ছিল ?

(গ) মৌখিক প্রশ্ন :

১। পৃথিবীর ইতিহাসের ধারাকে কয় ভাগে ভাগ করা হয় ?

২। ইতিহাসের কোন্ যুগকে 'যুগ সন্ধিক্ষণ' বলে ?

৩। মধ্য যুগের শেষ দিকের সমাজের প্রধান বৈশিষ্ট্য কি ছিল ?

৪। জাতীয় রাষ্ট্রের ধারণার সৃষ্টির সাথে সাথে কোন্ ধারণার অবসান হয় ?

৫। মধ্য যুগের শেষ দিকের সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য কি ?

৬। মধ্য যুগের শেষে অর্থনীতি কি কেবল কৃষিভিত্তিক ছিল ?

৭। ভারতে কোন্ সময় থেকে মধ্য যুগের সূচনা হয় ?

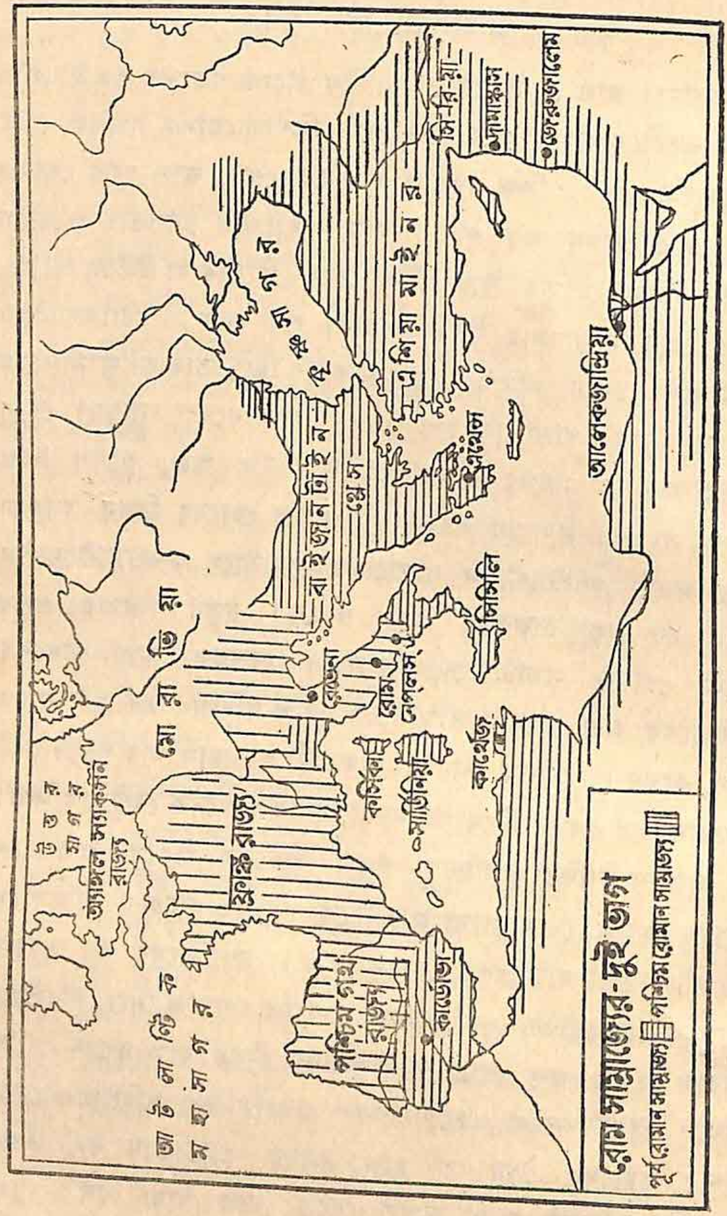
৮। ইওরোপ ও এশিয়াতে কি একই সঙ্গে মধ্য যুগের অবসান হয় ?

দ্বিতীয় অধ্যায়

পাশ্চাত্যে মধ্য যুগ

তোমরা জান যে ইওরোপে প্রাচীন গ্রীসের পতনের পর ইটালীর রোম নগরীকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে বিশাল রোমক সাম্রাজ্য আর রোমক সভ্যতা। কিন্তু দ্বিতীয় শতকের শেষ ভাগ হতে রোমক সাম্রাজ্যের ভাঙ্গন শুরু হয়। রোম সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগে তৃতীয় শতক থেকেই উত্তর দিক থেকে জার্মান বা টিউটন জাতিগুলি রোম সাম্রাজ্যের উপর আক্রমণ শুরু করে। রোমের ঐশ্বর্য জার্মানদের রোম আক্রমণের প্রধান কারণ ছিল, তাছাড়া জার্মানদের নিজেদের দেশে খাদ্যাভাব দেখা দেয়। জার্মানদের আক্রমণ রোধ করার জন্য রোমানগণ উত্তরে প্রাচীর নির্মাণ শুরু করেন কিন্তু তাতে সমস্যার সমাধান হয় না। সেজন্য রোমের বিপদ আশঙ্কা করে সম্রাট কনস্ট্যান্টাইন সাম্রাজ্যের পূর্ব ভাগে কনস্ট্যান্টিনোপল নামে এক নতুন রাজধানী স্থাপন করেন। চতুর্থ শতকের প্রথম দিকে রোমক সম্রাট ডায়োক্লিসিয়ান দেশরক্ষা আর শাসনের সুবিচারের জন্য রোমক সাম্রাজ্যকে পূর্ব ও পশ্চিম—এই দুই ভাগে ভাগ করেন। পশ্চিম ভাগের রাজধানী হয় রোম আর পূর্ব ভাগের রাজধানী হয় কনস্ট্যান্টিনোপল নগরী, যা ছিল অনেক বেশী সুরক্ষিত।

জার্মান জাতির আগমন :—পঞ্চম শতকের শুরুতে দলে দলে জার্মান জাতি রোম সাম্রাজ্যের দিকে আসতে থাকে। ইতিহাসে এই ঘটনা 'গ্রেট মাইগ্রেশন' নামে খ্যাত। জার্মানদের গথ শাখার নেতা থিয়োডোরিক পূর্ব রোমক সম্রাটের অনুমতি নিয়ে ইটালীতে বসবাস করার জন্য প্রায় দু লক্ষ নরনারীসহ যাত্রা করেন। কি কারণে তাঁরা স্বদেশ ছেড়ে বিপদ ও অনিশ্চিত ভবিষ্যৎকে মেনে নেন? রোমের ঐশ্বর্য বা রাজ্য জয়ের প্রলোভনে নয়, নিছক আশ্রয়ের খোঁজেই তারা স্বদেশ ছেড়ে যেতে বাধ্য হন। দুর্ধর্ষ হূণ জাতি তাদের বিতাড়িত করে।


আটলান্টিক মহাসাগর
উত্তর সাগর
অ্যাংলো স্যাক্সন রাজ্য
মোরাভিয়া
ফ্রাঙ্কিশ রাজ্য
পশ্চিম গথ রাজ্য
কর্সিকা
সার্ডিনিয়া
রোম
নেপলস
রেভেনা
সিসিলি
কার্থেজ
বাইজানটাইন
থ্রেস
এথেন্স
কৃষ্ণ সাগর
এশিয়া মাইনর
সিরিয়া
দামাস্কাস
জেরুজালেম
আলেকজান্দ্রিয়া
রোম সাম্রাজ্যের-দুই ভাগ
পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য
পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্য

হূণ জাতিঃ—হূণগণ চীনদেশের উত্তরাংশ আর মোঙ্গোলিয়ার বিশাল ভূখণ্ডে বসবাস করত। তারা ছিল যাযাবর, তাদের কোন স্থায়ী বসতি ছিল না। উর্বর দেশের খোঁজে তারা ঘোড়ার পিঠে চেপে দেশ দেশান্তর ঘুরে বেড়াত। তীর-ধনুক নিয়ে যুদ্ধ করত। তারা প্রথমে চীনে আক্রমণ চালায়। চীনের সম্রাটগণ যাযাবর জাতির আক্রমণ থেকে রক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে চীনের বিখ্যাত প্রাচীর নির্মাণ করেন—যা চীনের মহাপ্রাচীর (The Great Wall) নামে সুপরিচিত। ঐ প্রাচীরের উত্তর দিকে বসবাসকারী হূণগণ চতুর্থ শতকের গোড়ার দিকে রোম সাম্রাজ্যের উত্তর সীমায় হাজির হয়। হূণদের আক্রমণের চাপে বাধ্য হয়ে জার্মানীর দানিয়ুব অঞ্চলের গথগণ দানিয়ুব নদী পার হয়ে রোম সাম্রাজ্যে প্রবেশ করে।

রোমের সম্রাট থিয়োডোসিয়াস জার্মান গথদের একটি শাখা যারা ভিসিগথ নামে পরিচিত ছিল তাদের বীরত্বে মুগ্ধ হন এবং ৪০ হাজার ভিসিগথ সৈন্যকে রোমের সেনাবাহিনীতে নিয়োগ করেন।

এ্যালারিক ছিলেন ভিসিগথদের নেতা। তিনি ৪০০ খ্রীস্টাব্দে প্রথমবার ইটালী আক্রমণ করেন। এ্যালারিককে বাধা দেন রোমের এক সেনাপতি স্টিলিকো—তিনি ছিলেন বিদেশী—ভ্যাণ্ডাল জাতীয়। রোমের তখন এমন অবস্থা যে একদল হানাদারকে বাধা দিতে অপর একদল হানাদারের ওপর নির্ভর করতে হত।

এ্যালারিক পর পর তিনবার ইটালী আক্রমণ করেন। রোমান নেতাগণ এ্যালারিককে অর্থ দিতে রাজী হয়। কিন্তু ভিসিগথরা রোমান সাম্রাজ্যে বসবাস করার জন্য জমি দাবী করলে রোমান সম্রাট অসম্মত হন। তারপর এ্যালারিক প্রবল বিক্রমে ৪১০ খ্রীস্টাব্দে রোম আক্রমণ করেন। ছয়দিন ধরে চলে লুঠ আর নরহত্যার তাণ্ডবলীলা। রোম যেন হয়ে ওঠে এক শ্মশান। রোমের দুর্বল সম্রাট রোম থেকে পালিয়ে রেভেনার দুর্গে আশ্রয় নিয়ে নিজের প্রাণ বাঁচালেন।

জার্মানদের মধ্যে কেবল ভিসিগথরা রোম আক্রমণ করে নি, ভ্যাণ্ডাল, লম্বার্ড, ফ্রাঙ্ক, বার্গেণ্ডিয়ান, স্যাকসন, অস্ট্রোগথ প্রভৃতি বহু জাতিও রোম সাম্রাজ্য আক্রমণ করে। অবশ্য তারা সকলেই হূণজাতির আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত হয়েই রোম সাম্রাজ্য আক্রমণ করে। দুর্বল রোম সাম্রাজ্যের পক্ষে ঐ আঘাত সহ্য করা সম্ভবপর হয় নি।

ভ্যাণ্ডালরা গল দেশে (বর্তমান ফ্রান্স) প্রবেশ করে—সেখানে দু বছর ধরে চলে তাদের অত্যাচার-উৎপীড়ন। গল থেকে ভ্যাণ্ডালরা স্পেনে যায়, সেখানেও এক রাজ্য স্থাপন করে।

গেসেরিক ছিলেন ভ্যাণ্ডালদের একজন নেতা। রোমানদের লেখায় তাঁকে জেনসেরিক বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। গেসেরিকের নেতৃত্বে ভ্যাণ্ডালরা আফ্রিকায় প্রবেশ করে কার্থেজ অধিকার করে। আফ্রিকায় রোমের যে সাম্রাজ্য ছিল তার অবসান হয়। ভূমধ্যসাগরের বুকে ভ্যাণ্ডালদের একাধিপত্য গড়ে ওঠে। ভ্যাণ্ডালগণ রোম আক্রমণ করে রোমের বুকে যে অত্যাচার চালায় তা এ্যালারিকের অত্যাচারের মাত্রাকে ছাপিয়ে যায়। ইংরেজী ভাষায় ভ্যাণ্ডালদের প্রভাব এখনও রয়ে গেছে লুঠ-পাট, অরাজকতার ক্ষেত্রে 'ভ্যাণ্ডালইজম' শব্দের ব্যবহার আজও চলে আসছে।

ফ্রাঙ্ক্ জাতির লোকেরা গল দেশ দখল করে এক রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। রোমের সম্রাটের কাছে নামে মাত্র অধীনতা স্বীকার করে তারা স্বাধীনভাবে রাজ্য চালাত।

এ্যাটিলার আক্রমণ ঃ—তোমরা জেনেছ যে হূণজাতির আক্রমণের চাপেই জার্মানরা রোম সাম্রাজ্যে প্রবেশ করে। হূণগণ কৃষ্ণসাগরের তীর পর্যন্ত জার্মানদের পিছনে ধাওয়া করে কিন্তু ৪৫২ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে তারা রোম সাম্রাজ্যে প্রবেশ করে নি। এ্যাটিলার নেতৃত্বে ৪৫২ খ্রীস্টাব্দে হূণগণ ইটালী আক্রমণ করে। এ্যাটিলা ছিলেন দেখতে কুৎসিত, মাথায় খাটো, মাথা ছিল বিরাট, চ্যাপ্টা নাক, গোঁফ-দাড়িহীন মুখ—দেখলেই ভয় লাগত। তিনি ছিলেন অত্যন্ত

নিষ্ঠুর প্রকৃতির। জার্মানগণ আর রোমকগণ তাঁকে 'বিধাতার রোষানল' বলে বর্ণনা করেছেন।

এ্যাটিলা ইটালী আক্রমণ করলে গথগণ প্রাণপণ যুদ্ধ করে তাঁকে বাধাদানের চেষ্টা করে, কিন্তু ব্যর্থ হয়। এ্যাটিলা রোম



এ্যাটিলা ও অপর একজন হূণ

নগরীতে প্রবেশ করেন—সকলে মনে করেন যে রোম নগরীর বুঝি বা আর নিস্তার নেই। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ রোমের প্রধান ধর্মযাজক প্রথম লিওর কথায় সন্তুষ্ট হয়ে এ্যাটিলা রোম ছেড়ে চলে গেলে রোম সে যাত্রায় রক্ষা পায়।

এ্যাটিলা ইওরোপ থেকে এশিয়ার পশ্চিম সীমা পর্যন্ত যে বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন তাঁর মৃত্যুর কিছুকাল পরেই তা ভেঙ্গে যায়।

রোমের পতন ঃ—জার্মান জাতিসমূহ আর হূণ আক্রমণের ফলে রোম সাম্রাজ্যের পতন আসন্ন হয়ে ওঠে। ওডাএকার নামে একজন জার্মান নেতা ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিম রোম সাম্রাজ্য ধ্বংস করেন। পূর্ব দিকের রোম সাম্রাজ্য বজায় থাকে। পূর্ব রোম সম্রাটের অনুমতিক্রমে অস্ট্রোগথ নেতা থিয়োডোরিক ওডাএকারকে পরাজিত করে রোম অধিকার করেন। রোমে গথ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

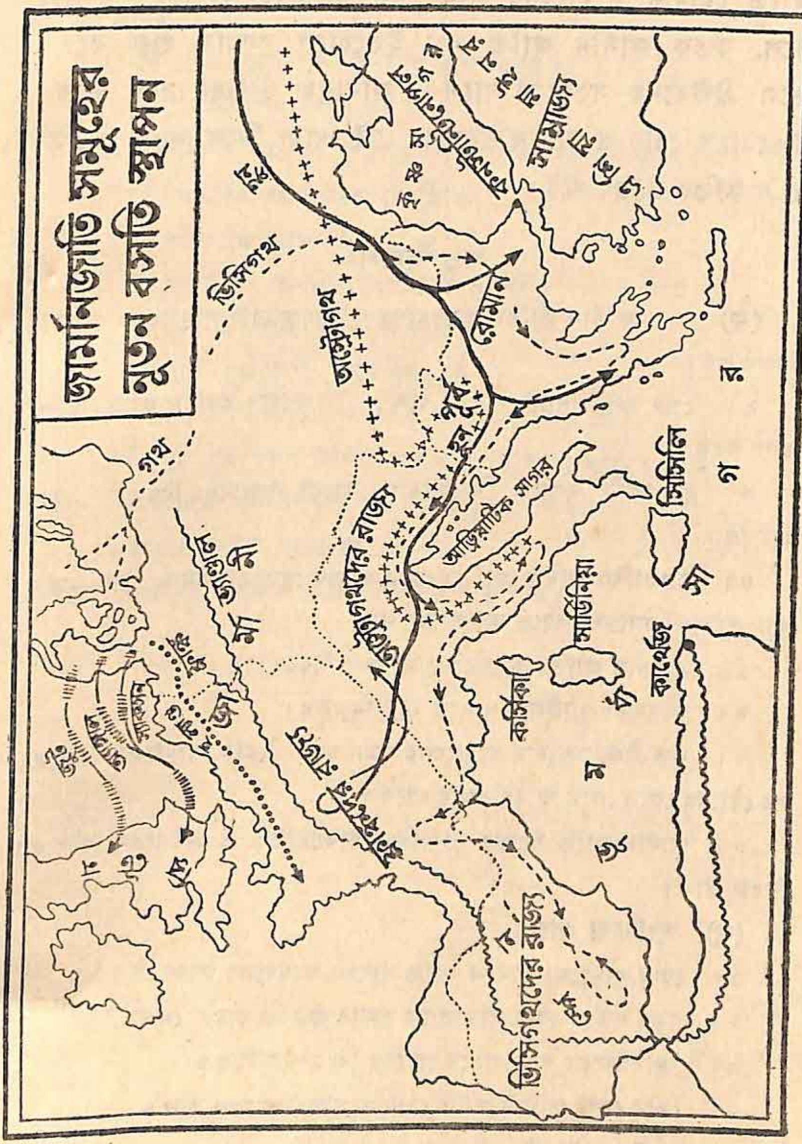
রোমের সাম্রাজ্য ধ্বংসের পরেও রোমক আইন আর রাজনৈতিক ঐক্যের আদর্শের অস্তিত্ব বজায় থাকে। ইওরোপের নানা দেশ রোমক আইনের অনুকরণ করতে থাকে। ৪৩৮ খ্রীস্টাব্দে থিয়োডসিয়ান বিধি নামক বিখ্যাত আইন বিধি সংকলন করা হয়।

রোমের রাজনৈতিক ঐক্যের আদর্শ লক্ষ্য করার বিষয়। বাস্তব ক্ষেত্রে শাসনের সুবিধের জন্য রোম সাম্রাজ্যকে দু ভাগে ভাগ করা হলেও দুজন সম্রাট যুগ্মভাবে সাম্রাজ্য শাসন করেন—এই প্রকার চিন্তা-ভাবনা অব্যাহত থাকে। সারা সভ্য জগতের জন্য একটি সরকার—এই চিন্তা সারা মধ্য যুগে ইওরোপের মানুষের মনে প্রভাব বিস্তার করে।

জার্মান আক্রমণকারীদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মনৈতিক জীবনঃ—জার্মানরা ছিল বীরের জাতি। সীজার আর ঐতিহাসিক টেসিটাসের লেখা থেকে তাদের বিষয় জানা যায়। জার্মানদের সমাজে অভিজাত, স্বাধীন মানুষ (freeman) আর দাস এই তিন গোষ্ঠীর অস্তিত্ব ছিল। সমাজে নারীর সম্মান বজায় ছিল। পারিবারিক জীবনের বন্ধনকে পবিত্র জ্ঞান করা হত। পশুপালন, কৃষি আর শিকার ছিল শান্তির সময়ের উপজীবিকা।

জার্মানদের রাজনৈতিক জীবনে গণতন্ত্রের অস্তিত্ব ছিল। জার্মানদের বিভিন্ন শাখা ছিল। প্রতিটির একটি করে সর্দার ছিল। শাসন-ব্যবস্থায় তিনটি ভাগ ছিল—(১) জাতি (২) কাউন্টি বা হাণ্ড্রেড মুট (৩) ভিলেজ বা ফোক মুট। ফোক মুট বা স্বাধীন প্রজাদের সভায় জনগণের স্বার্থ রক্ষার বিষয় আলোচনা করা হত।

জার্মানদের ধর্মের সঙ্গে প্রকৃতির উপাসনার যথেষ্ট মিল ছিল। সমাজে কোন পুরোহিত ছিল না। বাড়ির কর্তা পুরোহিতের কাজ করতেন আর প্রয়োজনে তাদেরই একজনকে পুরোহিতের দায়িত্ব পালন করতে হত।


জার্মানজাতি সমূহের
নূতন বসতি স্থাপন
ভিসিগথ
অস্ট্রোগথ
রোমান
আড্রিয়াটিক সাগর
সার্ডিনিয়া
কর্সিকা
সিসিলি
কার্থেজ
ভিসিগথদের রাজ্য

অস্ট্রোগথ, ভিসিগথ, ভ্যাণ্ডাল, লম্বার্ড, ফ্রাঙ্ক্ প্রভৃতি জার্মান জাতি রোমান সাম্রাজ্যের নানা অংশে, গথরা স্পেনে, ফ্রাঙ্করা গলে, কতক জার্মান জাতি মধ্য ইওরোপে বসবাস শুরু করে। ফলে খ্রীস্টধর্মের সংস্পর্শে আসে। জার্মানরা খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করে। ইওরোপে রোম ও জার্মান সভ্যতার দুই ধারা মিলে নতুন সভ্যতা ও সংস্কৃতির উন্মেষ ঘটে।

অনুশীলনী

(ক) ১। জার্মান জাতির আক্রমণের পূর্ব পর্যন্ত রোম সাম্রাজ্যের অবস্থার উল্লেখ কর।

২। 'গ্রেট মাইগ্রেশান' কাকে বলে? কি কারণে জার্মান জাতি স্বদেশ ত্যাগ করে?

৩। হূণ জাতি সম্পর্কে কি জান? তাদের সবচেয়ে বিখ্যাত নেতার নাম কি?

৪। এ্যালারিক জার্মান জাতির কোন শাখার নেতা ছিলেন? তাঁর নেতৃত্বে রোম সাম্রাজ্য আক্রমণ সম্বন্ধে আলোচনা কর।

৫। ভ্যাণ্ডাল জাতির আক্রমণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৬। হূণ নেতা এ্যাটিলার সম্পর্কে যা জান লেখ।

৭। কত খ্রীস্টাব্দে রোম সাম্রাজ্যের পতন হয়? রোম সাম্রাজ্যের পতনের পর রোমের কোন্ কোন্ আদর্শ বজায় থাকে?

৮। জার্মান জাতি সমূহের সামাজিক রাজনৈতিক ও ধর্মনৈতিক জীবনের বিবরণ দাও।

(খ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:

১। রোম সাম্রাজ্যে জার্মান জাতি সমূহের আগমনের কারণ কি কি?

২। চতুর্থ শতকে রোম সাম্রাজ্যকে রক্ষার জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়?

৩। ভিসিগথদের সঙ্গে প্রথমে রোমের কি সম্পর্ক ছিল?

৪। কোন্ কোন্ জার্মান জাতি রোম সাম্রাজ্য আক্রমণ করে?

৫। এ্যাটিলার ইটালী অভিযানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৬। জার্মান আগমনকারীরা খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করলে ইওরোপে তার কি প্রভাব পড়ে?

(গ) মৌখিক প্রশ্ন :

১। রোমের পূর্ব দিকে নতুন রাজধানীর নাম কি ছিল? কে ঐ নগরীর প্রতিষ্ঠা করেন?

২। কে রোম সাম্রাজ্যকে দুই ভাগে ভাগ করেন?

৩। 'গ্রেট মাইগ্রেশন' কখন শুরু হয়?

৪। জার্মান জাতির রোম সাম্রাজ্যে আগমনের সর্বপ্রধান কারণ কি?

৫। ভিসিগথদের প্রধান নেতা কে ছিলেন?

৬। গেসেরিক কে ছিলেন?

৭। 'ভ্যাণ্ডালিজম' কথাটির উৎপত্তি কি কারণে?

৮। ফ্রাঙ্ক জাতি কোন দেশ দখল করে?

৯। 'বিধাতার রোষানল' কাকে বলা হত?

১০। ৪৭৬ খ্রীস্টাব্দে পশ্চিম রোম সাম্রাজ্য কে ধ্বংস করেন?

১১। কাদের লেখা থেকে আমরা জার্মান জাতি সম্বন্ধে জানতে পারি?

১২। জার্মানদের রাজনৈতিক জীবনের কাঠামো কি ছিল?

১৩। জার্মান সমাজে পুরোহিত ছিল কি?

১৪। জার্মানরা কিভাবে খ্রীস্টধর্মের স্পর্শ লাভ করে?

তৃতীয় অধ্যায়

ইওরোপে 'অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ' সম্বন্ধে অতিকথা

তোমরা জার্মান জাতিসমূহের আক্রমণের ফলে রোম সাম্রাজ্যের পতনের বিষয় জেনেছ। এখন তোমাদের রোম সাম্রাজ্যের পতনের শুরু থেকে নবম শতক পর্যন্ত সময়ে ইওরোপের অবস্থা সম্পর্কে বলছি। খ্রীস্টীয় ৪০০ অব্দ থেকে ৮০০ অব্দ পর্যন্ত সময়কে সাধারণতঃ 'অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ' (Dark Ages) বলা হয়ে থাকে।

একদল পণ্ডিত মনে করেন যে খ্রীস্টীয় পঞ্চম শতকে রোমের সমাজ ভেঙ্গে পড়ে আর তার সঙ্গে শুরু হয় জার্মান জাতিসমূহের আক্রমণ। এই জার্মানদের বলা হয়েছে 'বর্বর'। কিন্তু জার্মানরা মোটেই বর্বর ছিল না। তারা ছিল সুসভ্য জাতি অবশ্য রোমানদের মত উন্নত সভ্যতার অধিকারী তারা ছিল না। ঐ সব পণ্ডিতদের মতে রোমক সাম্রাজ্যের পতনের পর ইওরোপে শুরু হয় অজ্ঞানতা আর কুসংস্কারের প্রাধান্য। ইওরোপের কৃষ্টি, সংস্কৃতি চরম বিপর্যয়ের মুখে এসে পড়ে। তাঁদের মতে ইওরোপের জনগণ লেখা পড়া ভুলতে বসে। কথ্য লাটিন ভাষার সঙ্গে লেখ্য লাটিনের যথেষ্ট পার্থক্য গড়ে ওঠে। অবশ্য লাটিন সম্বন্ধে জ্ঞান ও শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে অসুবিধার সৃষ্টি করে। খুব অল্পসংখ্যক লোকই লাটিন ভাষা বুঝতে পারত, কিন্তু জ্ঞানের মাধ্যম ছিল ঐ দুরূহ লাটিন। এই সময় লাটিন না জানা থাকলেও লোকে মাতৃভাষায় লিখতে সাহসী হত না। লোকে ব্যাকরণ ভুলে গিয়েছিল।

যদি আমরা মনে করি যে কোন যুগে কোন বিখ্যাত পণ্ডিতের আবির্ভাব না ঘটলে সেই যুগ 'অন্ধকারাচ্ছন্ন' তাহলে ঐ যুগ অর্থাৎ পঞ্চম থেকে নবম শতকের মধ্যবর্তী যুগকে অন্ধকারাচ্ছন্ন বলা যেতে পারে। সত্যি কথা বলতে কি পঞ্চম শতক কেন সম্রাট অগস্টাসের আমল থেকে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত ইওরোপে ভার্জিল-এর মত একজন

কবি বা টমাস এ্যাকুইনাসের মত একজন পণ্ডিতের দেখা মেলে নি—তাই বলে কি সত্যি সত্যি আমরা পঞ্চম থেকে নবম শতকের মধ্যবর্তী সময়কে অন্ধকারাচ্ছন্ন বলতে পারি ? যদি আমরা ইওরোপের ঐ সময়ের ইতিহাসকে একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে না দেখি তাহলে আমরা ঐ যুগকে 'অন্ধকারাচ্ছন্ন' কোন মতেই বলতে পারি না। পঞ্চম শতক থেকে ইওরোপে প্রাচীন বিদ্যার চর্চা ব্যাহত হলেও ইওরোপের কৃষ্টি, সংস্কৃতিকে সম্পূর্ণ ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা হয়। ইওরোপের শিক্ষা-দীক্ষাকে নতুন করে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা করা হয় একথাও বলা যেতে পারে। ঐ যুগ ছিল পথপ্রদর্শনকারীদের যুগ। ঐ সময় গীর্জা ছাড়া অন্য কোথাও শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না—সেকথা মনে রেখে যাজকেরা নতুন সংস্কৃতি গড়ে তোলার জন্য যে প্রচেষ্টা চালায় তা সত্যিই প্রশংসনীয়।

গীর্জাগুলিই ছিল কৃষ্টি-সংস্কৃতির কেন্দ্র। যাজকেরা অতীতের জ্ঞান যাতে নষ্ট না হয় তার প্রতি সতর্ক ছিলেন। তাঁদের প্রধান কাজই ছিল গ্রীক আর লাটিন ভাষায় লেখা পুরানো পুঁথিগুলির নকল করা। যাজকেরা অতীতের জ্ঞানকে ভবিষ্যতের জন্য সংরক্ষণ করতে পেরেছিলেন। ঐসব হাতে লেখা পুঁথিগুলো মধ্য যুগের শিল্প বস্তু হিসেবে সুপরিচিত। পুঁথিগুলির মধ্যে অনেকগুলি সুন্দরভাবে চিত্রিত বা নানা রঙে রাঙানো। সাধারণতঃ প্রথম অক্ষরটি নানাপ্রকার রং-এর সাহায্যে সুন্দর করে তোলা হত। পুঁথির চারিধারে পাখী, ফুল প্রভৃতি সবুজ, সোনালী, লাল, নীল প্রভৃতি রং-এ আঁকা হত।

যাজকরাই ছিলেন সবচেয়ে বেশী শিক্ষিত। তাঁরা লোককে পড়তে এবং লিখতে শেখাতেন। তাঁরা ব্যাকরণ, তর্কশাস্ত্র, গণিত আর ধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধে শিক্ষা দিতেন। এইভাবে যাজকেরা শিক্ষা লাভের ইচ্ছাকে বাঁচিয়ে রাখেন। মধ্য যুগে বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত তাঁদের সেই মহান প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে।

যাজকেরাই মানুষকে ন্যায়-অন্যায় শিক্ষা দিয়ে সমাজকে সুসভ্য রাখতে সাহায্য করেন।

যে সময়কে একদল পণ্ডিত 'অন্ধকারাচ্ছন্ন' আখ্যা দিয়াছেন সেই যুগে আমরা দেখি প্রাচীন সভ্যতাকে নিশ্চিহ্ন হতে দেওয়া হয় নাই। গীর্জা, রোমান ও জার্মান ভাবধারার মিলনে এক নতুন সভ্যতা ও সংস্কৃতির উন্মেষ হয়। সুতরাং ঐ সময়কে আমরা অহেতুক অন্ধকারাচ্ছন্ন হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি না।

অনুশীলনী

(ক) ১। এক শ্রেণীর পণ্ডিত ইওরোপের কোন সময়কে 'অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ' বলে থাকেন ?

২। জার্মান জাতির আক্রমণের পর ইওরোপের অবস্থা কিরূপ ছিল ?

৩। 'অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ' কি সত্যিই অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল ?

৪। ঐ যুগে শিক্ষা-সংস্কৃতির রক্ষাকর্তা কে ছিল ? কিভাবে শিক্ষা-সংস্কৃতিকে বজায় রাখা হয় ?

৫। মধ্য যুগের প্রথম দিকে যাজক শ্রেণীর ভূমিকার উল্লেখ কর।

(খ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১। 'বর্বর' জাতি বলতে কাদের বোঝান হয়েছে ? তারা কি সত্যই 'বর্বর' ছিল ?

২। মধ্য যুগের প্রথমভাগে শিক্ষা ও সংস্কৃতি কি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়েছিল ?

৩। মধ্য যুগে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত কিভাবে শিক্ষার চর্চা চলত ?

৪। মধ্য যুগে কিভাবে নতুন সভ্যতা ও সংস্কৃতির জন্ম হয় ?

(গ) মৌখিক প্রশ্ন :

১। কোন্ শতকে 'অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগের' সূচনা হয় ?

২। জার্মানরা কি রোমানদের মত উন্নত সভ্যতার অধিকারী ছিল ?

৩। কাদের প্রচেষ্টায় মধ্য যুগে শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয় নাই ?

৪। কোন্ যুগকে পথপ্রদর্শনকারীদের যুগ বলা যেতে পারে ?

৫। মধ্য যুগে সবচেয়ে বেশী শিক্ষিত কারা ছিলেন ?

———

চতুর্থ অধ্যায়

বাইজ্যাণ্টাইন সভ্যতা

তোমরা জার্মান জাতিসমূহের আক্রমণের ফলে রোম সাম্রাজ্যের পশ্চিম অংশের পতন বিষয় জেনেছ। পঞ্চম শতকে পশ্চিমের সাম্রাজ্যের পতন হলেও রোমান সাম্রাজ্যের পূর্বদিকের সাম্রাজ্য আরও প্রায় এক হাজার বছর বজায় ছিল। রোমের পূর্বাংশের সাম্রাজ্য বাইজ্যাণ্টাইন সাম্রাজ্য নামে খ্যাত।

কনস্ট্যাণ্টিনোপলের প্রতিষ্ঠা ঃ—রোমের বিপদ বুঝতে পেরে রোমের সম্রাট কনস্ট্যাণ্টাইন খ্রীস্টীয় তৃতীয় শতকে রোম সাম্রাজ্যের পূর্বদিকের ভূখণ্ডের জন্য এক নতুন রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর নামানুসারে ঐ নগরীর নাম ছিল কনস্ট্যাণ্টিনোপল। খ্রীস্টপূর্ব ৬০০ অব্দে ঐ জায়গায় গ্রীকগণ 'বাইজানটিয়াম' নামে একটি উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। ঐ বাইজানটিয়াম নাম থেকেই রোমের পূর্বের সাম্রাজ্য বাইজ্যাণ্টাইন সাম্রাজ্য নামে পরিচিত হয়।

ইওরোপের বল্‌কান উপদ্বীপ থেকে শুরু করে এশিয়া-মাইনর, সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, দামাস্কাস, মিশর প্রভৃতি দেশগুলি ছিল পূর্ব-রোম বা বাইজ্যাণ্টাইন সাম্রাজ্যের অধীন।

খ্রীস্টধর্ম—রাষ্ট্রের ধর্ম ঃ—রোমানগণ প্রথমে খ্রীস্টধর্মকে সুনজরে দেখে নাই। খ্রীস্টানদের উপর প্রথমে নির্যাতন করা হত। রোমের সম্রাট কনস্ট্যাণ্টাইন খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করার পরে অবস্থার পরিবর্তন হয়। তিনি খ্রীস্টধর্মকে রাষ্ট্রের ধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি দেন। রোম সাম্রাজ্যের পশ্চিমাংশের মত পূর্ব-রোম সাম্রাজ্যেও খ্রীস্টধর্ম প্রচারিত হয়। কিন্তু রোমের খ্রীস্টধর্মের সঙ্গে পূর্ব-রোম সাম্রাজ্যের খ্রীস্টধর্মের কিছু কিছু পার্থক্য ছিল।

পারস্যের সম্রাটদের মত বাইজ্যাণ্টাইনের সম্রাটগণও ধর্মের ওপর কর্তৃত্ব করতে চেষ্টা করেন। সম্রাট জাস্টিনিয়ান চার্চের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট ছিলেন।

ধর্ম বিষয়ে রোমে ছিল পোপের কর্তৃত্ব কিন্তু বাইজ্যাণ্টাইন সাম্রাজ্যে সম্রাটের কর্তৃত্ব চার্চের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল।



কনস্ট্যাণ্টাইন

বাইজ্যাণ্টাইনের খ্রীস্টান মিশনারী সম্প্রদায় কখনও পশ্চিম দিকে ধর্মমত প্রচার করেন নি কিন্তু তা সত্ত্বেও দানিয়ুব অঞ্চলের শ্লাভ আর রাশিয়ার রুশগণ বাইজ্যাণ্টাইনের গ্রীক-চার্চের প্রাধান্য স্বীকার করেছিল।

সম্রাট জাস্টিনিয়ান কর্তৃক ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা :—জাস্টিনিয়ান ৫২৭ খ্রীস্টাব্দে বাইজানটিয়ামের অর্থাৎ কনস্ট্যান্টিনোপলের সিংহাসনে বসেন। তিনি দীর্ঘ আটত্রিশ বছর রাজত্ব করেন। জাস্টিনিয়ানের রাজত্বকাল কনস্ট্যান্টিনোপলের 'গৌরবময় 'যুগ' নামে খ্যাত।

রোমের গৌরব আবার ফিরিয়ে আনবেন—এই ছিল জাস্টিনিয়ানের স্বপ্ন। ঐ স্বপ্নকে সফল করার জন্য তাঁর চেষ্টার অন্ত ছিল না। তিনি রাজকার্যের জন্য দিবারাত্র অমানুষিক পরিশ্রম করতেন। রাত্রে তাঁর বিশেষ ঘুমেরও প্রয়োজন হত না। পোশাক বা খাওয়া-দাওয়ার মধ্যে তাঁর কোন বিলাসিতা ছিল না।

জাস্টিনিয়ানের ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনার জন্য অনেক বার যুদ্ধ করতে হয়। পূর্ব ও পশ্চিমের অনেক দেশের লোক নিয়ে জাস্টিনিয়ানের সৈন্যদল গঠিত ছিল। বেলিসেরিয়াস ছিলেন জাস্টিনিয়ানের উপযুক্ত সেনাপতি। ঐ সেনাপতির সাহায্যে

জাস্টিনিয়ান সাম্রাজ্য বিস্তার করতে সক্ষম হন। বেলিসেরিয়াস উত্তর আফ্রিকার ভ্যাণ্ডালদের পরাস্ত করেন। তিনি ইটালী ও স্পেনের দক্ষিণ অংশ গথদের অধিকার থেকে মুক্ত করেন। এইভাবে রোম সাম্রাজ্যের অনেকাংশ মুক্ত হয়। কিন্তু জাস্টিনিয়ানের পরবর্তী সম্রাটগণ ছিলেন দুর্বল—সেই কারণে ঐ সকল স্থান আবার হাতছাড়া হয়ে যায়।

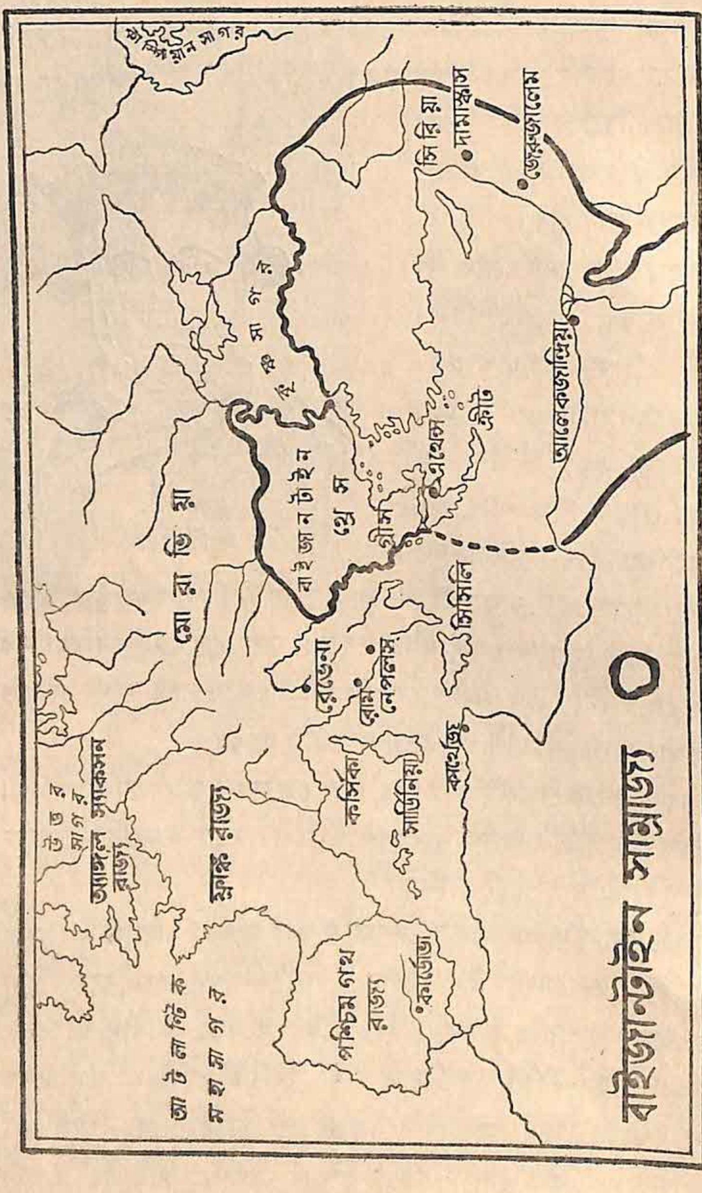


জাস্টিনিয়ান

জাস্টিনিয়ানের অনেক গুণ থাকা সত্ত্বেও বদগুণও ছিল। তিনি ছিলেন ঈর্ষাকাতর। যে সেনাপতির কৃতিত্বে উত্তর আফ্রিকা, ইটালী ও দক্ষিণ স্পেন মুক্ত হয় সেই বেলিসেরিয়াসকে তিনি সন্দেহ করতে থাকেন। বেলিসেরিয়াস কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন, তাঁর বিষয়-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়, অথচ শোনা যায় যে বেলিসেরিয়াসের কাছে হেরে গিয়ে এক জাতি বেলিসেরিয়াসকে তাদের রাজা করতে চায় কিন্তু বেলিসেরিয়াস সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন।

তৃতীয় শতক থেকেই পারস্যের সঙ্গে রোমের যুদ্ধ লেগেই থাকত। ষষ্ঠ শতকে জাস্টিনিয়ানের আমলেও পারস্যের সঙ্গে একাধিকবার যুদ্ধ হয়। কিন্তু ঐসব যুদ্ধ ছিল নিষ্ফল।

জাস্টিনিয়ান কর্তৃক আইন প্রণয়ন ও তার গুরুত্বঃ—জাস্টিনিয়ানের প্রধান কীর্তি রোমের আইন সঙ্কলন। আইন-সঙ্কলনকারীরূপে তিনি চিরস্মরণীয়। রোমের আইনের সংখ্যা ছিল অনেক, রোমান আইনের দুইটি অংশ ছিল—(১) সংবিধান এবং বিভিন্ন রোমান সম্রাটদের নির্দেশ নামা। (২) অতীতের খ্যাতনামা বিচারকগণের সিদ্ধান্ত। প্রাচীনকাল থেকেই রোমে বিচারকদের সিদ্ধান্ত আইনের মর্যাদা পেত। কিন্তু জাস্টিনিয়ান যখন কনস্ট্যান্টিনোপলের সম্রাট হন সে


বাইজানটাইন সাম্রাজ্য
আটলান্টিক মহাসাগর
উত্তর সাগর
অ্যাংলো স্যাকসন রাজ্য
ফ্রাঙ্ক রাজ্য
মোরাভিয়া
পশ্চিম গথ রাজ্য
কর্ডোভা
কর্সিকা
সার্ডিনিয়া
রেভেনা
রোম
নেপলস
সিসিলি
কার্থেজ
বাইজানটাইন
থ্রেস
গ্রীস
এথেন্স
ক্রীট
কৃষ্ণ সাগর
ক্যাস্পিয়ান সাগর
সিরিয়া
দামাস্কাস
জেরুজালেম
আলেকজান্দ্রিয়া

সময় আইন যে অবস্থায় থাকা উচিত সেই অবস্থায় ছিল না। প্রচলিত আইনগুলিকে সংকলিত করা হয় নি। আইনের ক্ষেত্রে বহু অসুবিধে আর সংঘাত ছিল; ফলে বিচার ব্যবস্থায় নানা অসুবিধে দেখা দেয়। ঐ অসুবিধে দূর করার জন্য জাস্টিনিয়ান একটি কমিটি গঠন করেন। ঐ কমিটির কাজ ছিল আইনগুলিকে সংগ্রহ করা, সংহতি বিধান করে সমগ্র সাম্রাজ্যের জন্য চালু করা। বিদ্বান বিচারক ও আইন-বিশারদগণের মত, সিদ্ধান্তগুলিকেও গ্রহণ করা হয়। সঙ্কলিত আইনগুলি জাস্টিনিয়ান কোড নামে খ্যাত।



জাস্টিনিয়ান ও সভাসদগণ

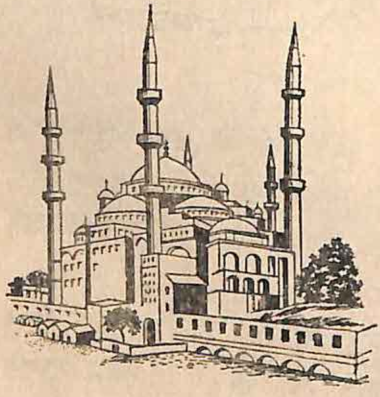
সম্রাট জাস্টিনিয়ানের আইন বিধির যথেষ্ট গুরুত্ব ছিল। ঐ আইনবিধির ফলে আইনের ক্ষেত্রে যে অরাজকতা ছিল তা দূর হয়, বহু অপ্রচলিত সিদ্ধান্ত বাতিল হয়ে যায়। ফলে আইনের প্রয়োগ সহজ হয়ে ওঠে।

ছাত্রদের সুবিধের জন্য রোমান আইনের কাঠামো ও আইনের ওপর মতামত বই আকারে প্রকাশ করা হয়। ঐ সকল সঙ্কলন আধুনিক যুগের ইওরোপের সকল দেশের আইনবিধি আদর্শ হয়ে ওঠে। আধুনিক যুগের ইওরোপের প্রায় সব দেশেই জাস্টিনিয়ানের আইনবিধির প্রভাবে আইন বিধি প্রণয়ন করা হয়। দ্বাদশ শতক থেকে ইওরোপে, আর পরবর্তীকালে জাস্টিনিয়ানের আইনের প্রভাব

দেখা দেয় সুদূর দক্ষিণ আফ্রিকা, সিংহল, গিনি, লুসিয়ানায়। ইওরোপ, এশিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকা সব মহাদেশেই জাস্টিনিয়ানের আইনবিধির মূল আদর্শের প্রভাব দেখা দেয়। ঐ আইনবিধির রোম সাম্রাজ্যের শেষ দিকের স্বৈরাচারী সম্রাটদের স্বৈরতন্ত্রের সমর্থন পাওয়া যায়। ঐ আইনবিধি ছিল যেন প্রাচ্য থেকে পাশ্চাত্যে স্বৈরাচারী শাসকদের রাজাকে ভগবান কর্তৃক দেওয়া রাজক্ষমতা নীতির বাহন।

নতুন রাজাদের সামন্তদের বিরুদ্ধে লড়াইএ আবার পরবর্তীকালে চাষীদের জমি থেকে উৎখাতের কাজে জাস্টিনিয়ানের আইন বিধির আশ্রয় লওয়া হয়।

স্থাপত্য ও শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতাঃ সম্রাট জাস্টিনিয়ান কেবল যোদ্ধা বা আইন সংরক্ষণের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন না, শিল্প ও স্থাপত্যের পৃষ্ঠপোষকতার জন্যও তিনি বিশেষ খ্যাতির অধিকারী ছিলেন। সেণ্ট সোফিয়া নামে কনস্ট্যান্টিনোপলের গীর্জাটি সম্রাট জাস্টিনিয়ানের শিল্প ও স্থাপত্যের প্রতি পৃষ্ঠপোষকতার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নিদর্শন।



সেণ্ট সোফিয়া গীর্জা

দুজন গ্রীক শিল্পী ছিলেন গীর্জাটির প্রধান রূপকার। তবুও গীর্জাটির নির্মাণ রীতিতে কেবল গ্রীক প্রভাবই ছিল না—পারসিক প্রভাবও ছিল। গ্রীক ও পারসিক শিল্প রীতির অপূর্ব নিদর্শন সেণ্ট সোফিয়া গীর্জা। গীর্জাটির মধ্যের গম্বুজটি ছিল উচ্চতায় ১৭৯ ফিট, পরিধি ১০৭ ফিট। গীর্জার স্থপতিগণ নিজেদের জ্ঞান সম্বন্ধে এতই নিশ্চিন্ত ছিলেন যে তাঁরা ঐ বিশাল গম্বুজের নীচের দিকে চল্লিশটি জানালা বসিয়ে ছিলেন। প্রায় ১০ হাজার লোক পাঁচ বছর পরিশ্রম করে গীর্জাটি নির্মাণ করে।

সেণ্ট সোফিয়া গীর্জার দেওয়ালের মোজাইকের কাজ শিল্পের অপূর্ব নিদর্শন। রঙ-বেরঙের কাঁচ, পাথর কিংবা ধাতুর পাত জোড়া দিয়ে আঁকা ছবি বাইজ্যাণ্টাইন চিত্রকলার বৈশিষ্ট্য ছিল।

ফ্রেস্কো (Fresco) চিত্রকলারও প্রচলন ছিল। মাউণ্ট এ্যাথমের গীর্জার দেওয়ালে ঐরকম ছবি দেখতে পাওয়া যায়। বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতেও বাইজ্যাণ্টাইন চিত্রকলার নিদর্শন পাওয়া যায়। ইটালীর চিত্র শিল্পের প্রথম দিকে বাইজ্যাণ্টাইন চিত্রকলার কিছু প্রভাব ছিল।

১৪৫৩ খ্রীস্টাব্দে তুর্কীরা কনস্ট্যান্টিনোপল অধিকার করে ঐ বিখ্যাত গীর্জাটিকে একটি মসজিদে পরিণত করে। ইসলাম ধর্মে মূর্তির কোন স্থান নেই—সেই কারণে গীর্জাটির দেওয়ালে মোজাইকে মিনা করা সুন্দর সুন্দর ছবিগুলির ওপর রং-এর প্রলেপ দিয়ে দেয়।

সেণ্ট সোফিয়া গীর্জাই বাইজ্যাণ্টাইন শিল্পরীতির একমাত্র নিদর্শন ছিল না। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে দুর্গ, প্রাসাদ, গীর্জা, স্নানাগার, সেতু রোমের অনুকরণে তৈরী করা হয়। তবে সিরিয়া বা এশিয়া মাইনর যেখানেই বাইজ্যাণ্টাইনের শিল্পরীতির নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে তার মধ্যে শতকরা পঞ্চাশ ভাগ সম্রাট জাস্টিনিয়ানের আমলের। ঐ ঘটনা থেকে অনুমান করা যায় যে জাস্টিনিয়ান স্থাপত্য ও শিল্পের কত বড় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ঐশ্বর্য ও সমৃদ্ধির প্রচারই ছিল বাইজ্যাণ্টাইন শিল্পরীতির প্রধান লক্ষ্য।

বাইজান্টিয়ামের গুরুত্বঃ বাইজান্টিয়াম বা কনস্ট্যান্টিনোপল নগরী ছিল সারা বাইজ্যাণ্টাইন সাম্রাজ্যের ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র। ভৌগোলিক অবস্থানেব ফলে ঐ নগরী ব্যবসা-বাণিজ্য কেন্দ্রে পরিণত হয়। সমুদ্রের কাছাকাছি ছিল ঐ নগরীর অবস্থান। কনস্ট্যান্টিনোপল নগরী পূর্ব ও পশ্চিম এশিয়া আর ইওরোপের সঙ্গে যোগাযোগ সহজ করেছিল।

চীন, ভারত, মিশর, আবিসিনিয়ার সঙ্গে বাইজান্টিয়ামের ব্যবসা-বাণিজ্য চলত। পরে রুশ দেশের সঙ্গেও ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু হয়। কৃষ্ণ সাগরের উপকূল থেকে আসত দাস, পশুর চামড়া আর শস্য।

আবিসিনিয়া থেকে আসত দাস, হাতির দাঁত, সোনা আর রত্ন। ভারত ও সিংহল থেকে আসত মশলা, গন্ধদ্রব্য, দামী পাথর। বাইজান্টিয়াম পাঠাত কাঁচের আর এনামেলের জিনিস আর অন্যান্য শিল্পপণ্য।

সম্রাট জাস্টিনিয়ানের আমল থেকে ইওরোপে চীন থেকে রেশম আমদানি করা হত। চীন রেশমের গুটি পোকার চাষ করত। ঐ পোকা চীনের বাইরে নিয়ে যেতে দিত না। একবার কয়েক দল সন্ন্যাসী গোপনে চীন থেকে কয়েকটি গুটি পোকা বাইজান্টিয়ামে নিয়ে আসেন। তারপর গুটি পোকার চাষ শুরু হয়, রেশম শিল্পও গড়ে ওঠে। ইওরোপের বাজারে আর চীনের রেশমী কাপড়ের একাধিপত্য থাকে না।

বাইজান্টিয়াম নগরী ছিল কৃষ্টি ও সংস্কৃতির রক্ষাকর্তা। পঞ্চম শতকে জার্মান জাতিসমূহের আক্রমণের ফলে গ্রীক-রোমক সভ্যতা ও সংস্কৃতির চর্চা বন্ধ হয়ে গেলেও বাইজান্টিয়ামে সে চর্চা অব্যাহত থাকে।

প্রাচীন গ্রীক উপনিবেশ বাইজান্টিয়ামের ওপর কনস্ট্যান্টিনোপল নগরী গড়ে ওঠার ফলে ঐখানে গ্রীক সভ্যতা ও সংস্কৃতির যথেষ্ট প্রভাব ছিল। ল্যাটিন ভাষায় লেখা রোমের আইনগুলি গ্রীক ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছিল। গ্রীক ভাষা ও সাহিত্য সযত্নে পড়া হত। মুসলমানগণ কনস্ট্যান্টিনোপল অধিকার করার আগে পর্যন্ত ঐ স্থানের পণ্ডিতগণ গ্রীক সাহিত্য নকল করে রাখতেন। তাঁরা গ্রীক ভাব-ধারাকে প্রসারিত করতে না পারলেও রক্ষা করতে পেরেছিলেন। তাঁরা ঐভাবে গ্রীক ভাবধারাকে রক্ষা না করলে পরবর্তীকালে মানবতাবাদিগণ গ্রীক ভাষায় লেখা পাণ্ডুলিপিগুলির সঙ্গে পরিচিত হতেন কিনা সন্দেহ।

বাইজান্টিয়ামের পণ্ডিতেরা বিশ্বকোষ রচনা করেছেন আবার ইতিহাসও লিখেছেন। কনস্ট্যান্টিনোপলে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ার আগে ঐ স্থানে উচ্চ শিক্ষার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল।

বাইজান্টিয়ামের গ্রীকগণ প্রাচীন গ্রীক দর্শনশাস্ত্র পড়তেন। এথেন্সের বিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্র পড়ান হত। গ্রীকগণ তাঁদের দার্শনিকদের লেখা বই থেকে যে তথ্য পেতেন তা পড়ে তার প্রভাবে ধর্মের ব্যাপারেও স্বাধীন চিন্তা ও যুক্তির প্রাধান্য স্বীকার করতেন। খ্রীস্টানদের মতে গ্রীক দর্শনের বিদ্যালয়ে ধর্মবিরোধী শিক্ষা দেওয়া হত।

বাইজান্টিয়ামে বিজ্ঞানের চর্চাও অব্যাহত ছিল। ঐ স্থানের মানুষ রেশম শিল্প গড়ে ওঠার সাথে সাথে রেশমী কাপড়ে নানারকম রং করার বিদ্যাও আয়ত্ত করে।

যুদ্ধক্ষেত্রে বারুদের ব্যবহার জানত। 'গ্রীক ফায়ার' নামে হাত-বোমার মত একরকম মারণাস্ত্র আবিষ্কার করা হয়েছিল।

বাইজান্টিয়ামে গ্রীক ও রোমক সভ্যতা ও সংস্কৃতির চর্চা অব্যাহত ছিল বলেই পশ্চিম ইওরোপের জনগণ হাজার বছর পরে নতুন করে অতীতের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছিল।

অনুশীলনী

(ক) ১। বাইজ্যাণ্টাইন সাম্রাজ্য কাকে বলে? ঐ সাম্রাজ্য কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়?

২। বাইজ্যাণ্টাইন সাম্রাজ্যের খ্রীস্টধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা কর।

৩। সম্রাট জাস্টিনিয়ানের সাম্রাজ্য বিস্তার সম্বন্ধে কি জান?

৪। সম্রাট জাস্টিনিয়ানের আইনবিধি সম্বন্ধে যা জান লেখ।

৫। সম্রাট জাস্টিনিয়ানের শিল্পানুরাগের বিষয় আলোচনা কর।

৬। বাইজ্যাণ্টাইন সাম্রাজ্যের গুরুত্ব সম্বন্ধে আলোচনা কর।

(খ) সংক্ষেপে উত্তর দাওঃ

১। কনস্ট্যান্টিনোপল নগরীর প্রতিষ্ঠার বিষয় উল্লেখ কর।

২। রোমানদের সঙ্গে খ্রীস্টধর্মের সম্পর্ক সম্বন্ধে আলোচনা কর।

৩। রোমের খ্রীস্টধর্মের সঙ্গে বাইজ্যাণ্টাইনের খ্রীস্টধর্মের পার্থক্য সম্বন্ধে উল্লেখ কর।

৪। বেলিসেরিয়াস সম্বন্ধে আলোচনা কর।

৫। সম্রাট জাস্টিনিয়ান ও বেলিসেরিয়াসের সম্পর্কের বিষয় আলোচনা কর।

৬। সম্রাট জাস্টিনিয়ানের আইনবিধির গুরুত্ব কি ছিল?

৭। বাইজ্যাণ্টাইনের শিল্প সম্বন্ধে আলোচনা কর।

৮। সেণ্ট সোফিয়া গীর্জা সম্বন্ধে আলোচনা কর।

৯। বাইজ্যাণ্টাইন সাম্রাজ্যের বাণিজ্য সম্বন্ধে কি জান?

১০। কৃষ্টি ও সংস্কৃতির কেন্দ্ররূপে কনস্ট্যাণ্টিনোপল নগরীর অবদানের উল্লেখ কর।

(গ) মৌখিক প্রশ্নাবলী :

১। রোম সাম্রাজ্যের কোন অংশ বাইজ্যাণ্টাইন সাম্রাজ্য নামে খ্যাত?

২। পূর্ব রোম সাম্রাজ্য কেন বাইজ্যাণ্টাইন সাম্রাজ্য নামে পরিচত হয়?

৩। বাইজাণ্টিয়াম নগরী কেন কনস্ট্যাণ্টিনোপল নামে পরিচিত হয়?

৪। কাহার আমল বাইজ্যাণ্টাইন সাম্রাজ্যের 'গৌরবময় যুগ'?

৫। বেলিসেরিয়াস কে ছিলেন?

৬। সম্রাট জাস্টিনিয়ানের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কীর্তি কি?

৭। সেণ্ট সোফিয়া গীর্জা কে প্রতিষ্ঠা করেন?

৮। খ্রীস্টানদের মতে গ্রীক দর্শনের বিদ্যালয়ে কি শিক্ষা দেওয়া হত?

৯। 'গ্রীক অগ্নি' কি?

১০। পশ্চিম ইওরোপ কিভাবে হাজার বছর পরে অতীতের কৃষ্টি-সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হয়েছিল?

পঞ্চম অধ্যায়

ইসলাম ও তাহার প্রভাব

খ্রীস্টীয় সপ্তম শতকের সূচনায় এশিয়ার পশ্চিম অংশে মরুময় আরব দেশে এক নতুন ধর্মের প্রচার করেন হজরৎ মহম্মদ। হজরৎ মহম্মদের প্রচারিত ধর্ম **ইসলাম** নামে পরিচিত।

আরব দেশ ও আরব জাতিঃ—আরব মরুময়, অনুর্বর দেশ। অবশ্য গোটা দেশটি বালুকাময় মরুভূমি ছিল না। মরুভূমির মাঝে মাঝে খেজুর গাছের ঝোপে ঘেরা মরূদ্যান আর ছোট ছোট জনপদ ছিল।

আরবদেশে প্রাচীনকাল থেকে বিভিন্ন সভ্যতার উদয় হয়েছিল। সুমেরীয়, ব্যাবিলনীয়, ফিনিশিয় আর ইহুদী সভ্যতার উদয় হয়েছিল আরবে। আরবরা ছিল সেমিটিক গোষ্ঠীভুক্ত। কিন্তু ঐ সকল প্রাচীন সভ্যতার পতনের পর আরবদেশের অবস্থা গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল।

আরবদের মধ্যে দুই ধরনের লোক ছিল—একদল লোক শহরে বাস করত আর একদল মরুভূমিতে যাযাবরের জীবন যাপন করত, তাদের বলা হত বেদুইন।

যে সব আরব শহরে বাস করত তারা লোহিত সমুদ্রের পূর্ব তীরে আর পারস্য উপসাগরের তীরে শহর গড়ে তোলে। তারা অনেকেই চাষ-আবাদ করত। আবার কিছু লোক পূর্বে ভারতবর্ষ আর পশ্চিমে রোমের সঙ্গে জলপথে ব্যবসা-বাণিজ্য চালাত।

মরুবাসী আরবরা ছিল যাযাবর বেদুইন। তাদের কোন স্থায়ী আবাস ছিল না। তারা ঘোড়া ও উট পালন করত আর তাদের পিঠে চেপে ঘুরে বেড়াত। কখনও কখনও মরুভূমির মধ্যে তাঁবু খাটিয়ে বিশ্রাম করত আবার কখনও উটের পিঠে শুয়ে

রাত কাটিয়ে দিত। তাদের প্রধান খাদ্য ছিল খেজুর আর উটের দুধ। প্রয়োজনে তারা লুঠপাট করত।

আরবদের অনেকগুলি দল বা উপদল ছিল। সাধারণতঃ এক বংশের জ্ঞাতিরা মিলে এক একটি উপদল গঠন করত। উপদলগুলির মধ্যে ঝগড়া-মারামারি-রক্তপাত লেগেই থাকত। কিন্তু আরবরা ছিল খুব অতিথিপরায়ণ। তারা শত্রু অতিথি হলে তাকেও সম্মান দেখাত। আরবদের মধ্যে বহু বিবাহ প্রথার প্রচলন ছিল।

আরবদের ধর্ম ছিল কুসংস্কারে পূর্ণ। তারা বহু দেবতার পূজা করত। এক একটি উপদলের এক একজন দেবতা ছিল। আপন আপন দেবতার প্রাধান্য নিয়ে বিবাদের অন্ত ছিল না। আরবরা মূর্তিপূজা করত। সেকালেও আরবদের প্রধান তীর্থস্থান ছিল মক্কা। সেখানের কাবার মন্দিরে তিন চারশ দেবমূর্তি ছিল, তার মধ্যে প্রধান ছিলেন আল্লা। আরবরা মক্কার কাবার মন্দিরে তীর্থ করার সময় নিজেদের মধ্যে বিবাদ ভুলে থাকত।

হজরৎ মহম্মদ ও তাঁর ধর্মমতঃ—হজরৎ মহম্মদ ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক ছিলেন। ৫৭০ খ্রীস্টাব্দে মক্কা নগরীতে হজরৎ মহম্মদের জন্ম হয়। তাঁর বাবার নাম ছিল আবদুল্লা। তিনি ছিলেন আরব জাতির কোয়ারিশ সম্প্রদায় ভুক্ত। ঐ কোয়ারিশদের মক্কার কাবার মন্দির পরিচালনায় একাধিপত্য ছিল। মহম্মদের জন্মের কয়েকমাস আগেই তাঁর বাবা মারা যান আর তাঁর বয়স যখন ছয় তখন তাঁর মাও মারা যান। বাবা-মার মৃত্যুর পর তাঁর কাকা তাঁকে লালনপালন করতে থাকেন। কাকার ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য মহম্মদকে প্রায়ই নানা দেশে যেতে হত, ফলে নানা জাতির লোকের সঙ্গে তিনি মেলা-মেশার সুযোগ পান। ইহুদী ও খ্রীস্টধর্মের সঙ্গেও তাঁর পরিচয় হয়।

মহম্মদের আর্থিক অবস্থা ভাল না থাকায় তিনি খাদিজা নামে এক ধনী মহিলার অধীনে চাকরি করতে থাকেন। পরে খাদিজার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়, তারপর তাঁর আর্থিক দুশ্চিন্তার অবসান

হয়। তিনি ঈশ্বর-চিন্তায় মগ্ন হন। যখন মহম্মদের বয়স প্রায় ৫০ বছর তখন তিনি মক্কার কাছে হিরা পর্বতের গুহায় তপস্যার মধ্যে ঈশ্বরের বাণী লাভ করেন। ঐ বাণীই ইসলাম ধর্ম। ইসলাম অর্থ ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণ।

মহম্মদ প্রথমে তাঁর পত্নীর কাছে তাঁর ধর্মমত প্রকাশ করেন, তিনি ঐ ধর্মের গুরুত্ব তখন স্বীকার করেন। তিন বছর পরে মহম্মদ প্রকাশ্যে তাঁর ধর্মমত অর্থাৎ ইসলাম ধর্ম প্রচার করতে থাকেন।

মহম্মদ বহু দেবতার আরাধনা, মূর্তি পূজার নিন্দা করতে থাকেন। তিনি বলতেন ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়। তিনি নিজেকে ঈশ্বর প্রেরিত পুরুষ (পয়গম্বর) বলতেন। মক্কার বহু লোক মহম্মদের বিরোধিতা করতে থাকে। তারা মহম্মদকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে। মহম্মদ তাঁর প্রিয় শিষ্য আবুবকরকে সঙ্গে নিয়ে রাত্রির অন্ধকারে মক্কা থেকে মদিনায় চলে যান। ঐ ঘটনা ঘটে ৬২২ খ্রীস্টাব্দে। ঐ সময় থেকে হিজিরাব্দ গণনা করা হয়ে থাকে। মদিনার লোকজন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে থাকে। ৬৩০ খ্রীস্টাব্দে মহম্মদ সসৈন্যে মদিনা ত্যাগ করে মক্কা যান আর মক্কা জয় করেন। তিনি মক্কার অধিবাসীদের সঙ্গে উদার ব্যবহার করেন। কাবার মন্দিরের দেবমূর্তিগুলি ধ্বংস করা হয়। মক্কার লোকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। ৬৩২ খ্রীস্টাব্দে মহম্মদ দেহত্যাগ করেন।

মহম্মদের ধর্মমত ছিল সরল ও অনাড়ম্বর। তিনি বলতেন যে তাঁর মুখ দিয়ে ঈশ্বর বা আল্লা শেষ বাণী পাঠিয়েছেন। আল্লার কোন মূর্তি নেই—সেই কারণে ইসলামে মূর্তি পূজা নিষিদ্ধ। যে কোন লোক নিজে নিজে আল্লার কাছে প্রার্থনা জানাতে পারে—কোন পুরোহিতের প্রয়োজন নেই। ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা মুসলমান নামে পরিচিত।। তাদের ধর্মগ্রন্থ কোরাণ।

মহম্মদ ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের পাঁচটি উপদেশ দেন। তিনি

বলতেন (১) কল্মা অর্থাৎ ধর্মবিশ্বাসকে স্বীকৃতি দিতে হবে। (২) দিনে পাঁচবার মক্কার দিকে মুখ ফিরিয়ে নামাজ (প্রার্থনা) পড়তে হবে। (৩) জাকৎ বা গরীবকে ভিক্ষা দিতে হবে। (৪) রমজান অর্থাৎ রমজানের মাসে উপবাস করে রোজা পালন করতে হবে। (৫) হজ বা মক্কায় তীর্থযাত্রা করতে হবে। তাছাড়া ইসলামে মদ্যপান, জুয়ার মত বদ অভ্যাস নিষিদ্ধ।

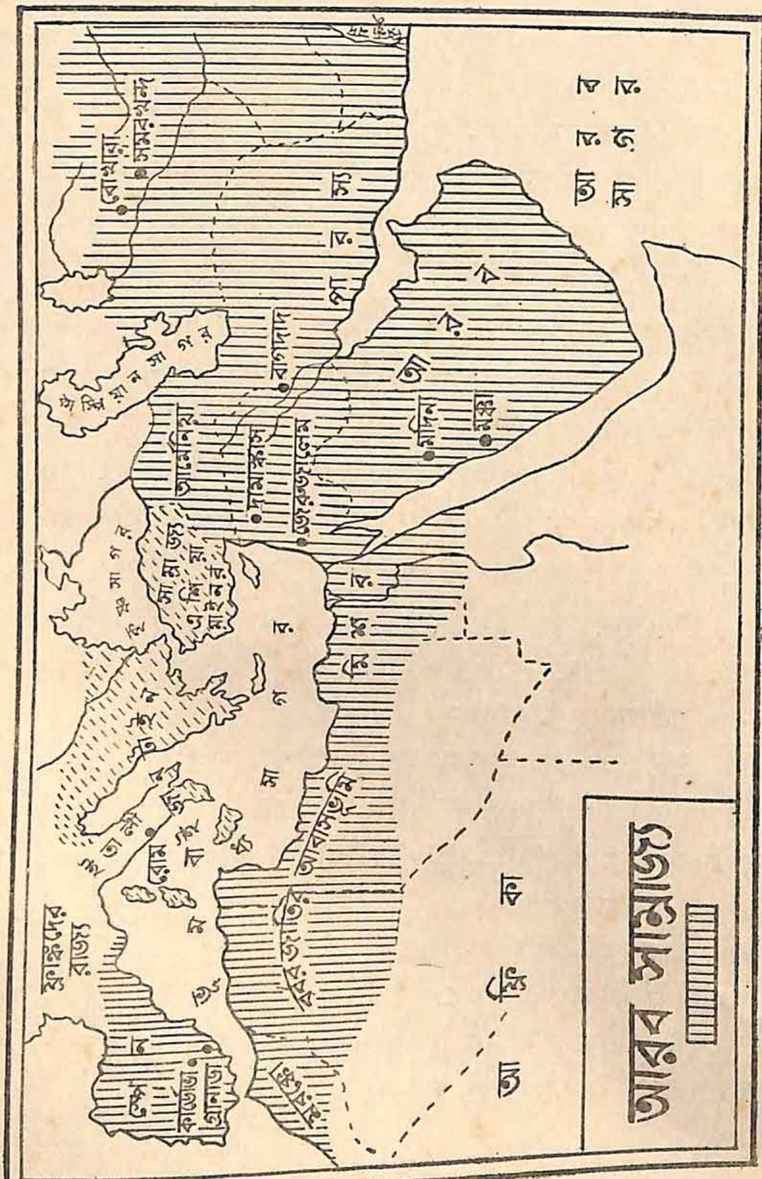
ইসলামে সকলে সমান—কোন জাতিভেদ বা বর্ণভেদ নেই। মসজিদে সম্রাট ও ভিক্ষুক একই সঙ্গে নামাজ পড়তে পারে। ইসলাম ধর্মের সরলতা দুর্ধর্ষ আরবদের অন্তরে এক নতুন প্রেরণা সঞ্চার করে। তারা নববলে বলীয়ান হয়ে আরবদেশের বাইরে ইসলাম ধর্ম প্রসারে আত্মনিয়োগ করে। মহম্মদের মৃত্যুর মাত্র একশ বছর পরে ইসলাম ধর্ম এশিয়া, আফ্রিকা এমনকি ইওরোপের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। ইসলামের বিস্তারের কথা তোমাদের পরে বলছি ; তার আগে কেন ইসলামের প্রসার হয় তার বিষয় জানা দরকার।

ইসলামের বিস্তারের কারণঃ—একাধিক কারণে আরবদের প্রচেষ্টায় ইসলামের জয়যাত্রা সম্ভব হয়েছিল। প্রথমতঃ বাইজাণ্টাইন ও পারসিক সাম্রাজ্য পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধে দুর্বল হয়ে পড়ে। জার্মানদের রোম সাম্রাজ্য আক্রমণের প্রাকালে রোমান সাম্রাজ্যের যে দুরবস্থা ছিল ঐ দুই সাম্রাজ্যেরও আরবদের আক্রমণের প্রাকালে একই অবস্থা ছিল। দ্বিতীয়তঃ আরবগণ ছিল নতুন ধর্মে দীক্ষালাভের পর অনুপ্রাণিত, নববলে বলীয়ান। তৃতীয়তঃ আরবদের সেনাপতিরা ছিল সুদক্ষ আর অসমসাহসী, আরবরা এক হাতে তলোয়ার আর একহাতে কোরাণ নিয়ে জয়যাত্রায় বার হয়েছিল। তারা বিজিত জাতিদের কাছে দুটি শর্ত রাখত—হয় কর দিয়ে নতি স্বীকার কর অথবা মুসলমান হয়ে সমান অধিকার লাভ কর। নানা দেশের লোক ইসলামের সমানাধিকারের নীতিতে আকৃষ্ট হয় ফলে ইসলাম প্রসার লাভ করে।

খলিফাগণঃ—ইসলামের খলিফারা ছিলেন একাধারে ধর্মগুরু ও রাষ্ট্রনায়ক। হজরৎ মহম্মদ তাঁর প্রধান শিষ্য আবুবকরকে খলিফা নিযুক্ত করে যান। আবুবকরের পরে ওমর, ওমরের পরে ওসমান ও আলি খলিফা হন। আলির পর ইসলামের একতা নষ্ট হয়ে যায়। আলি ছিলেন মহম্মদের জামাতা। তিনি শত্রুর চক্রান্তে প্রাণ হারান। আলির পর খলিফা হল মোয়াবিয়া। তাঁর বংশ উমাইয়াদ বংশ নামে পরিচিত। আলির হাসান ও হোসেন নামে দুই পুত্র ছিল। একদল মহম্মদের দৌহিত্র হিসাবে খলিফার পদ তাদের প্রাপ্য বলিয়া দাবী করে।' উমাইয়াদরা খলিফার পদ ছাড়ে না। হাসানকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করা হয়। তখন মোয়াবিয়ার পুত্র এজিদ দামাস্কাসে খলিফা ছিলেন। হোসেন সপরিবারে মাত্র দুশত অনুচর নিয়ে মক্কার দিকে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে কারবালার মাঠে এজিদের সমর্থক কুফার সৈন্যদলের কাছে পরাজিত ও নিহত হন। হোসেনের বংশধরদের হত্যা করা হয়। মুসলমানরা সিয়া ও সুন্নী —এই দুভাগে ভাগ হয়ে যায়। যারা মহম্মদের বংশধরদের খিলাফতের অধিকারী মনে করত তারা সিয়া আর যারা বিরোধী ছিল তারা সুন্নী নামে পরিচিত হয়।

৭৫০ খ্রীস্টাব্দে আব্বাসীয়রা উমাইয়াদদের রাজধানী দামাস্কাস ধ্বংস করে, বাগদাদে নতুন রাজধানী স্থাপন করে। আব্বাস ছিলেন মহম্মদের কাকা সেই কারণে আব্বাসীয়দের সিয়ারা সমর্থন করে। আব্বাসীয় খলিফাদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ছিলেন হারুন-অল-রসিদ। আরব্য উপন্যাসের পাতায় তিনি অমর হয়ে আছেন। তাঁর দরবার জাঁকজমকের জন্য প্রসিদ্ধ। তাঁর দরবারে বহু ভারতীয়, গ্রীক, ইহুদী মনীষী পারসিক ও আরবদের সঙ্গে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করতেন। আরবী ভাষায় বহু গ্রীক ও সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ করা হয়েছিল।

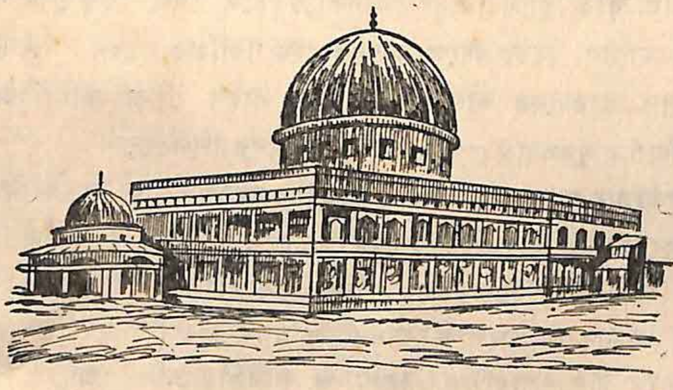
স্পেনের উমাইয়াদ বংশীয় শাসকরা একসময়ে নিজেদের খলিফা বলে ঘোষণা করেছিলেন।



[উত্তর আফ্রিকা ও স্পেনে ইসলামের প্রসার]

আরব সাম্রাজ্যঃ—তোমরা জান যে মহম্মদের মৃত্যুর একশ বছরের মধ্যে আরব সাম্রাজ্য সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, পারস্য ও মিশর ছাড়াও পুবদিকে অক্ষুনদী ও সিন্ধু নদ ছাড়িয়ে তুর্কীস্থান ও ভারতের সিন্ধুদেশ পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। পশ্চিমে উত্তর আফ্রিকা ও ইওরোপের স্পেন দখল করে আরবরা গলে ঢুকে পড়ে। আরবদের বিশাল সাম্রাজ্যের মধ্যে স্পেন সম্পর্কে আলোচনার প্রয়োজন আছে।

উমাইয়াদ বংশের আবদুল রহমান স্পেন রাজ্যের রাজা হন। ঐ রাজ্যের রাজা প্রথমে 'আমীর' পরে খলিফা উপাধি ব্যবহার করেন। অধিবাসীদের মধ্যে আরবরা ছিল সংখ্যায় অল্প, গল ও মুর জাতীয় ইসলামে দীক্ষিত লোকের সংখ্যা ছিল বেশী। মুসলমান আমলে স্পেনের রাজধানী ছিল কার্ডোভা। কার্ডোভাতে প্রাসাদ আর বড় বড় বাড়ির সংখ্যা ছিল নাকি ৬০ হাজার। সেখানের বিশ্ব-বিদ্যালয়ে বিদেশের বহু ছাত্র পড়তে আসত। শহরে অনেকগুলি

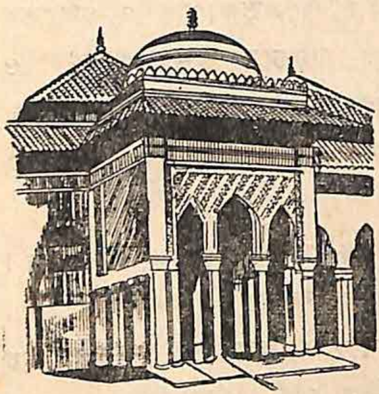


ডোম অফ দি রক

গ্রন্থাগারও ছিল। রাজকীয় গ্রন্থাগারের বইএর সংখ্যা ছিল চার লক্ষ।

কার্ডোভার বিখ্যাত মসজিদটি জেরুসালেমের ডোম অফ দি রকের কথা মনে করিয়ে দেয়।

স্পেনে গ্রানাডার বিখ্যাত প্রাসাদ **আলহামরা** সারা পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রাসাদ। স্তম্ভ, তোরণের গঠন কৌশল, দেওয়ালের অলংকরণের শোভা ছিল বিস্ময়কর। তাছাড়া অর্ধচন্দ্রাকৃতি খিলান, মাথায় গোলাকার গম্বুজ, আকাশ-ছোঁয়া মিনার বিস্ময়ের উদ্রেক করে। সেভিল, টলেডো প্রভৃতি নগরেও বহু প্রাসাদ ও মসজিদ ছিল। সঙ্গীত, কারুশিল্প, ধর্মসহিষ্ণুতা, বিদ্যাচর্চার জন্য স্পেনের মুসলমান শাসকগণ প্রশংসার পাত্র।



আলহামরা

ইসলামের জয়যাত্রায় ইওরোপে প্রতিক্রিয়া :—মুসলমানগণ স্পেন অধিকারের পর গলে প্রবেশ করলে মনে হয় যে সারা গ্রীস্টান ইওরোপ বুঝি মুসলমানদের অধিকারে চলে গেল, কিন্তু ফ্রাঙ্ক বীর চার্লস মার্টেল তুরের রণক্ষেত্রে আরবদের পরাজিত করেন। গ্রীষ্টান ইওরোপ আরবদের হাত থেকে রক্ষা পায়। কিন্তু জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শনচর্চায় মুসলমান স্পেন ছিল ইওরোপের শিক্ষাগুরু।

সভ্যতায় আরবদের দান :—আরবগণ সভ্যজগতকে অনেক কিছুই দান করেছে। সাম্রাজ্য বিস্তারের আগে তারা অন্যান্য সভ্যজাতির চেয়ে অনেক পিছিয়ে ছিল। কিন্তু সভ্যজাতিদের সংস্পর্শের ফলে তারা সভ্যতার আলোক পায়। তারপর তারাই হয় সভ্যতার বাহক। গ্রীক, পারসিক, ইহুদী ও ভারতীয় জ্ঞান বিজ্ঞানের সঙ্গে নিজেদের বিদ্যা ও জ্ঞান মিলিয়ে তারা এক নতুন সভ্যতা গড়ে তোলে। মধ্য যুগে ইওরোপে আলোর সন্ধান দেয় কার্ডোভা, প্যালের্মো। শিল্পে আরবদের প্রভাবের কথা স্পেন প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। তাছাড়া গণিত শাস্ত্র, চিকিৎসা বিদ্যা, জ্যোতিষতত্ত্ব, রসায়ন, ইতিহাস নানা বিষয়ে আরবদের অবদান যথেষ্ট। আরবরা গ্রীক ও

ভারতীয়দের কাছ থেকে শেখে জ্যোতির্বিদ্যা, জ্যামিতি, গণিত, বীজগণিত ও আয়ুর্বেদ। অঙ্কের রাশি ও দশমিক ভগ্নাংশ ভারত থেকে নিয়ে গিয়ে ইওরোপকে দেয়। আর্যভট্ট ও বরাহমিহিরের জ্যোতির্বিদ্যা, এরিস্টটলের রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইউক্লিডের জ্যামিতি, গেলেনের চিকিৎসা শাস্ত্র সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে ইওরোপে প্রচার করে। বীজগণিতের প্রতিশব্দ 'অ্যালজেব্রা'র উৎপত্তি আরবী 'আলজীবর' থেকে। রসায়ন শাস্ত্রেও আরবরা ছিল অগ্রণী। 'কেমিস্ট্রী' শব্দের উৎপত্তি আরবী 'কিমিয়া' থেকে। চীনদেশ থেকে কাগজ তৈরীর জ্ঞান শিখে আরবরা সেই বিদ্যা ইওরোপকে দান করে। কাব্য, সাহিত্য, ইতিহাস ও জীবনচরিত রচনায় আরবগণের কৃতিত্ব সকলেরই জানা আছে। আরবগণ গ্রীক ভাষায় লেখা বইগুলি আরবীতে অনুবাদ করে সেইগুলিকে রক্ষা করে।

কয়েকজন পণ্ডিত ঃ এখন তোমাদের মধ্যযুগের কয়েকজন বিখ্যাত মুসলমান মনীষীদের কথা বলছি।

আবুসিনা ছিলেন চিকিৎসা বিজ্ঞানে শ্রেষ্ঠ। বোখারায় তাঁর জন্ম হয়। তিনি খোরাসানে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা শুরু করেন। **ইবন রসিদ** ছিলেন দর্শনে সুপণ্ডিত। তিনি কার্ডোভায় বসবাস করতেন। এরিস্টটলের দর্শনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। তিনি বৈজ্ঞানিক যুক্তি দিয়ে দর্শনকে বিচার করতেন। সেভিলের **ইবন খালদুন** ছিলেন বিখ্যাত ঐতিহাসিক। তাঁর রচনায় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী, যুক্তি ও সত্যনিষ্ঠার পরিচয় মেলে। **অল্ বিরুনী** ছিলেন গজনীর সুলতান মামুদের সভাসদ। তিনি ভারতে এসেছিলেন। তিনি সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য আর ভারতীয় দর্শন পড়েছিলেন। তাঁর বিখ্যাত বই 'তারিখ-ই-হিন্দ'।

ইবন্ বতুতা ছিলেন মুর দেশীয় পর্যটক। দিল্লীর সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলকের আমলে নানা দেশ ঘুরে তিনি এদেশে এসেছিলেন। কিছুকাল দিল্লীর কাজীর পদে বহাল ছিলেন। তিনি সুলতানের দূত হিসেবে চীন যাত্রা করেছিলেন। তাঁর ভ্রমণ কাহিনীর নাম 'সফর নামা'।

অনুশীলনী

(ক) ১। আরব দেশ ও আরব জাতি সম্বন্ধে যা জান লেখ।

২। হজরৎ মহম্মদের সম্বন্ধে আলোচনা কর।

৩। হজরৎ মহম্মদের ধর্মমত সম্বন্ধে যা জান লেখ।

৪। খলিফাগণের ইতিহাস লেখ।

৫। আরব সাম্রাজ্যের বিস্তারের কথা লেখ।

৬। সভ্যতায় আরবদের দান সম্বন্ধে আলোচনা কর।

৭। মধ্য যুগের কয়েকজন আরব পণ্ডিতের বিষয় যা জান লেখ।

(খ) সংক্ষেপে উত্তর দাও ঃ

১। কি কারণে ইসলাম বিস্তারলাভ করে ?

২। সিয়া ও সুন্নীর উৎপত্তি সম্বন্ধে কি জান ?

৩। ইসলাম ধর্মের অধীন স্পেনের ইতিহাস লেখ।

৪। ইসলামের জয়যাত্রায় ইওরোপে কি প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় ?

৫। আরবদের বিজ্ঞান সম্বন্ধে জ্ঞানের উল্লেখ কর।

(গ) মৌখিক প্রশ্নাবলী ঃ

১। ইসলাম ধর্মের কে, কোন সময়, কোন দেশে প্রবর্তন করেন ?

২। বেদুইন বলতে কাদের বোঝায় ?

৩। কোন্ সময় থেকে হিজিরাব্দ গণনা করা হয় ?

৪। আব্বাসীয়দের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত শাসক কে ছিলেন ?

৫। মুসলমান শাসনকালে স্পেনের রাজধানীর নাম কি ছিল ?

৬। 'আলহামরা' কি ?

৭। কার্ডোভায় বাস করতেন এমন একজন আরব দার্শনিকের নাম বল।

৮। ইবন খালদুন্ কে ছিলেন ?

৯। 'তারিখ-ই-হিন্দ' কে রচনা করেন ?

১০। ইবন বতুতার লেখা ভ্রমণ কাহিনীর নাম বল।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মধ্য যুগে পশ্চিম ইওরোপ

শার্লামেন

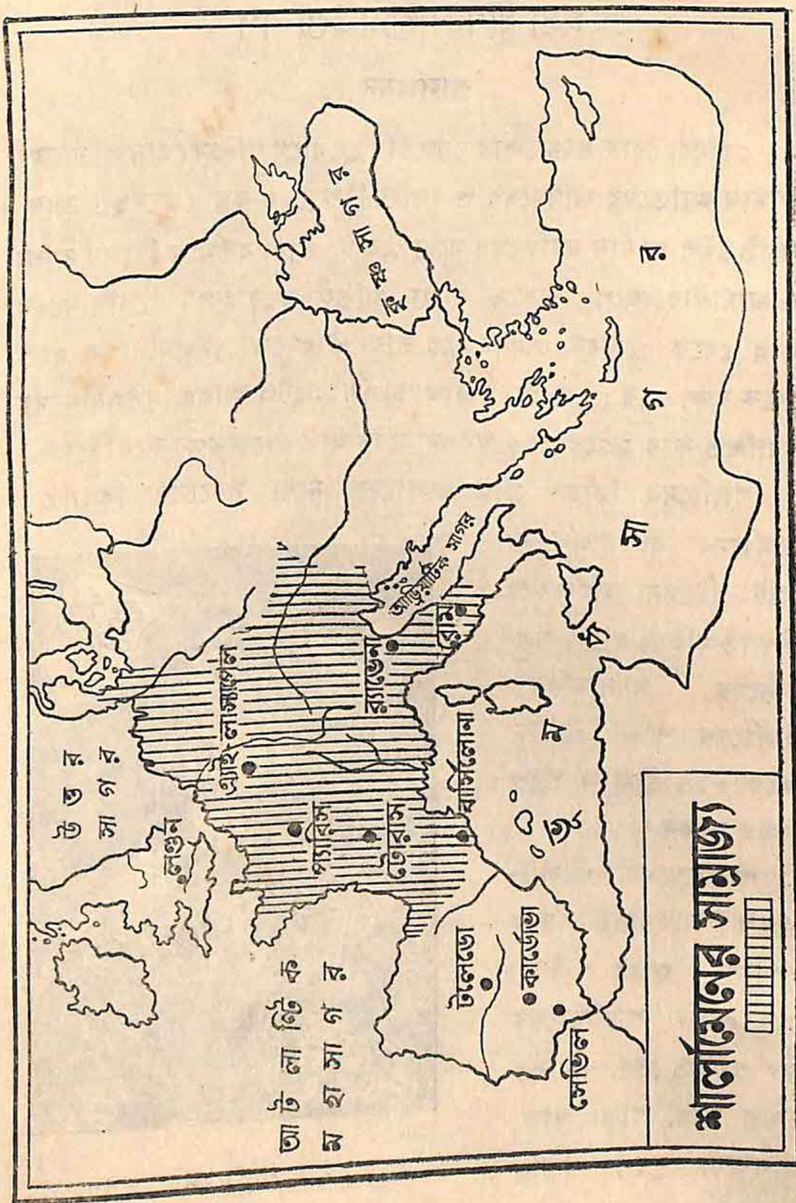
তোমরা রোম সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগে পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যে জার্মান জাতিদের আগমনের ও বসতি বিস্তারের কথা জেনেছ। ফ্রাঙ্ক্ জাতি ছিল জার্মান জাতিদের মধ্যে একটি, তারা বর্তমান দিনের ফ্রান্স ও জার্মানীর অংশ বিশেষে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল। রোমানদের কাছ থেকে খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করে তারা ঐ ধর্মকে মুসলমানদের হাত থেকে রক্ষা করে। ফ্রাঙ্কদের রাজা চার্লস মার্টেল আরব মুসলমানদের পরাজিত করে ইওরোপকে মুসলমানদের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন।

শার্লামেন ছিলেন ফ্রাঙ্ক রাজাদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত। শার্লামেন বা চার্লস দি গ্রেট ছিলেন বাগদাদের বিখ্যাত খলিফা হারুণ-অল-রসিদের সমসাময়িক। শার্লামেন ৭৬৮ খ্রীস্টাব্দ থেকে ৮১৪ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন।



শার্লামেন

শার্লামেনের জীবনী-লেখক আইনহার্ড তাঁর সম্পর্কে সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন। শার্লামেনের ছিল সুগঠিত দেহ, বড় বড় উজ্জ্বল চোখ, খাড়া নাক, হাসিমাখা মুখ। তিনি ফ্রাঙ্কদের সাধারণ জাতীয় পোশাক পরতেন—যা ছিল পাজামা, কোট আর লম্বা পিরান। উৎসবের দিনে মাঝে মাঝে পরতেন রূপোলী


শার্লামেনের সাম্রাজ্য
আটলান্টিক মহাসাগর
উত্তর সাগর
বাল্টিক সাগর
ভূমধ্য সাগর
আড্রিয়াটিক সাগর
লণ্ডন
প্যারিস
তোরস
বার্সিলোনা
রাভেন্না
রোম
টলেডো
কর্ডোভা
সেভিল

পাড়ের জামা, মাথায় মণিমুক্তো দেওয়া মুকুট, কোমরে সোনারূপোর কাজ করা হাতলযুক্ত তলোয়ার। তিনি ছেলেমেয়েদের স্নেহ করতেন। শিকার, সাঁতার আর ঘোড়ায় চড়তে খুব ভালবাসতেন। তাঁর গায়ে ছিল অসুরের শক্তি। কিন্তু তিনি ছিলেন খুব সহজ সরল মানুষ।

রাজ্যবিস্তার : শার্লামেন ছিলেন মধ্যযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ বীর। তিনি তাঁর ৪৬ বছরের রাজত্বকালে ৫২ বার যুদ্ধ করেন। পিরানীজ ও আল্‌পস পর্বতের ওপারেও তাঁর অধিকার বিস্তৃত ছিল। স্পেনের মুররা, উত্তর ইটালীর লম্বার্ডরা, জার্মানীর স্যাকসনরা, আর পূর্ব ইওরোপের আভররা তাঁর কাছে নতি স্বীকার করে। স্যাকসনরা শার্লামেনকে যথেষ্ট বেগ দেয়। তিনিও তাঁদের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছিলেন। বহু স্যাকসনকে হত্যা করা হয়েছিল। তারা খ্রীস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিল।

দিগ্বিজয়ী হিসেবে শার্লামেনের খ্যাতি বহু দূরে ছড়িয়ে পড়ে। বাগদাদের খলিফা হারুণ-অল্‌-রসিদ তাঁকে বন্ধুত্বের নমুনা হিসেবে একটি হাতী আর একটি জলঘড়ি উপহার দিয়েছিলেন।

রোমক সাম্রাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা : রোম নগরী ছিল খ্রীস্টান ধর্মের প্রধান কেন্দ্র। এখানে বাস করতেন খ্রীস্টানদের প্রধান বা ধর্মগুরু যাঁকে বলা হত পোপ। অবশ্য পূর্ব রোম সাম্রাজ্যের আলাদা চার্চ বা (খ্রীস্ট) ধর্ম ব্যবস্থা ছিল, তারা ছিল গ্রীক চার্চের অধীন। কিন্তু পশ্চিম আর মধ্য ইওরোপের খ্রীস্টানরা ছিল রোমান চার্চ আর পোপের অধীন।

শার্লামেনের সময় রোমের পোপ ছিলেন তৃতীয় লিও। তিনি তাঁর শত্রুদের হাতে লাঞ্ছিত হয়েছিলেন। শার্লামেন পোপ তৃতীয় লিওকে সমর্থন আর সাহায্য দিয়ে রোমে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তাঁর শত্রুদের দমন করা হয়েছিল। পোপ ছিলেন শার্লামেনের প্রতি কৃতজ্ঞ। কৃতজ্ঞতা জানাতে গিয়ে লিও এমন একটি কাজ করেছিলেন যা ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। ৮০০ খ্রীস্টাব্দে

খ্রীস্টমাসের উৎসবের সময় রোমের সেণ্ট পিটার গীর্জায় শার্লামেন নতজানু অবস্থায় প্রার্থনা করছিলেন। সেই সময় পোপ তৃতীয় লিও তাঁর মাথায় মুকুট পরিয়ে দেন। তারপর শার্লামেনকে রোম সম্রাট অগাস্টাস বলে জয়ধ্বনি করে ওঠেন। সমবেত জনতাও একইভাবে জয়ধ্বনি দেয়। ঐ ঘটনার মধ্য দিয়ে পশ্চিম রোম সাম্রাজ্য যেন পুনরায় জেগে ওঠে। ফ্রাঙ্ক্ সাম্রাজ্য ঐ সময় থেকে রোমান সাম্রাজ্য নামে পরিচিত হল।

রাজ্যাভিষেকের গুরুত্ব: শার্লামেনকে পোপ রোমান সম্রাট হিসেবে অভিনন্দন জানালেও, লোকে সম্রাট আর পোপের অধীনে



শার্লামেনের রাজ্যাভিষেক

ইওরোপ ঐক্যবদ্ধ হল—এই বিশ্বাস করলেও কার্যতঃ কোন পরিবর্তন হয় নি। কারণ শার্লামেন ছিলেন মনে-প্রাণে ফ্রাঙ্ক্। ৮০০ খ্রীস্টাব্দে পোপ কর্তৃক শার্লামেনের অভিষেকের ফলে ফ্রাঙ্ক্ সাম্রাজ্যের নতুন নামকরণ ছাড়া আর কিছুই হয়নি। 'রোম' নামের প্রতি ইওরোপের লোকের মোহ আর গভীর শ্রদ্ধা লক্ষ্য করে শার্লামেন তাঁর রাজধানীর

নাম দিয়েছিলেন 'নতুন রোম' বা আকেন। কিন্তু বাইজান্টিয়ামের শাসক আর জনগণ শার্লামেনকে রোম সাম্রাজ্যের সম্রাট হিসেবে স্বীকৃতি দেয়নি।

চার্চ ও রাষ্ট্রের সম্পর্কঃ শার্লামেন নিজেকে চার্চের চেয়ে বেশী ক্ষমতার অধিকারী বলে মনে করতেন। সেজন্য চার্চের বিষয়-সম্পত্তি, শিক্ষা, আচার-অনুষ্ঠান, ধর্ম বিষয়ের শাস্তি, চার্চের সংগঠন—সব কিছুর ওপর তাঁর নিয়ন্ত্রণ ছিল। চার্চে বিভিন্ন নিয়োগের ব্যাপারেও তাঁর কর্তৃত্ব বজায় ছিল।

শার্লামেনের মৃত্যুর পর পোপ কর্তৃক তাঁর অভিষেকের গুরুত্ব বোঝা গিয়েছিল। শার্লামেনের বংশধরগণ রোমান সম্রাট উপাধি ব্যবহার করতেন। কিন্তু খ্রীস্টান জগতের প্রাধান্যকে কেন্দ্র করে সম্রাট আর পোপদের মধ্যে বহুদিন বিরোধ চলেছিল। ঐ বিরোধের বিষয় তোমরা প্রতিষ্ঠাকরণের প্রতিদ্বন্দ্বিতা (Investiture contest) প্রসঙ্গে জানবে।

শার্লামেনের দরবার—শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতাঃ শার্লামেন সেকালের রোমের গৌরব ফিরিয়ে আনার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। তিনি রাইন নদীর তীরে আকেনে নতুন রাজধানী স্থাপন করেন। ঐ নগরীতে রাজপ্রাসাদ, অনেকগুলি গীর্জা, মণ্ডপ, স্নানাগার নির্মাণ করা হয়েছিল। বাইজান্টিয়াম ও র‍্যাভেনার অনুকরণে মোজাইক দিয়ে ঐগুলি সাজানো হয়েছিল। র‍্যাভেনা থেকে ইটালীর স্থপতিরা এসে কলোন অঞ্চলে বড় বড় ঘর-বাড়ি তৈয়ারী করেছিল। আকেনের (নতুন রোম) ক্যাথিড্রাল গীর্জাটি আজও সম্রাট শার্লামেনের শিল্প-প্রীতির পরিচয় দিচ্ছে।

শার্লামেনের রাজসভায় বহু জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তির সমাবেশ ঘটেছিল। শার্লামেন কেবল শিল্পানুরাগীই ছিলেন না, তিনি বিদ্যোৎসাহীও ছিলেন। তিনি ছিলেন যেন আমাদের দেশের গুপ্ত বংশের সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের মত শাসক। কবি থিওডল্‌ফ তাঁর রাজসভার সুন্দর বর্ণনা দিয়ে গেছেন তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে। ইংরেজ

পণ্ডিত অ্যালকুইন, লম্বার্ডের পণ্ডিত পল আর পিসার পিটার তাঁর রাজসভায় এসেছিলেন। অ্যালকুইন ছিলেন সবচেয়ে প্রসিদ্ধ পণ্ডিত। দিনেমারগণ ইংলণ্ড আক্রমণ করলে তিনি গৃহহারা হন এবং নানাদেশ ঘুরে বেড়াতে থাকেন। শার্লামেন তাঁকে সাদরে গ্রহণ করেন। রাজ-পুরীতে অ্যালকুইনের বিদ্যালয় বসে। সম্রাট নিজে, তাঁর সন্তানরা আর সভাসদরা অ্যালকুইনের কাছে ছাত্রের মত জ্ঞান লাভ করতেন। শার্লামেন জার্মান ও ল্যাটিন ভাষায় কথা বলতে পারতেন, গ্রীক ভাষা বুঝতেন, কিন্তু তিনি ছিলেন নিরক্ষর। তবুও তিনি ছিলেন পরম বিদ্যানুরাগী। তাঁর আমলে অনেকগুলি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ফ্রাঙ্কদের লোকগাথাগুলি সঙ্কলিত করে কবিতায় রূপান্তরিত হয়। অনেক ভাল ভাল বই নকল করে প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়। শার্লামেনের আমলের বিদ্যালয়কে অনুসরণ করে পরে ইওরোপে অনেকগুলি বিদ্যালয় গড়ে ওঠে। এইভাবে ইওরোপে মধ্য যুগে জ্ঞানের আলো জ্বলে ওঠে। শার্লামেনের সেনাপতি রোল্যাণ্ডের বীরত্ব ও আত্মত্যাগকে বিষয়বস্তু করে 'রোল্যাণ্ডের লোকগীতি' নামে যে লোকগাথার স্বৃষ্টি হয় তার মধ্য দিয়ে রোল্যাণ্ডের মত শার্লামেনের নামও অমর হয়ে আছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মঠের জীবনযাত্রা

মঙ্ক্ ও নান্ঃ রোম সাম্রাজ্যের পতনের পর ইওরোপে যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়—সেই অবস্থায় চার্চের ক্ষমতা অতিমাত্রায় বেড়ে যায়। মধ্য যুগের সূচনায় লেখাপড়ার চর্চা ছিল খুবই কম। শিক্ষিত বলতে প্রধানতঃ যাজকদের বোঝাত। সমাজের সকল স্তরের মানুষের ওপর চার্চ ও পুরোহিতদের (যাজক) যথেষ্ট প্রভাব ছিল। যাজকগণ সাধারণতঃ মঠে বাস করতেন। মঠগুলি সাধারণতঃ থাকত লোকালয় থেকে দূরে। পুরুষ ও স্ত্রী দু প্রকার মঠবাসী ছিলেন।

পুরুষ মঠবাসী সন্ন্যাসীদের বলা হত মঙ্ক্ আর স্ত্রী মঠবাসী সন্ন্যাসিনীদের বলা হত নান্। মঙ্ক্ ও নান্‌দের জন্য আলাদা আলাদা ব্যবস্থা ছিল। তাঁরা মঠাধ্যক্ষ ও মঠাধ্যক্ষার তৈরী নিয়ম-কানুন মেনে চলতেন। মঠবাসীদের নিয়মিত প্রার্থনা ও পড়াশোনা করতে হত। কিছু সময় মৌনব্রত পালন করতে হত। তাছাড়া জমি চাষ, হাতের লেখা পুঁথি নকল করা, বিদ্যালয় চালনা বা আতুরদের সেবা করতে হত।



মধ্য যুগের একটি গীর্জা (মঠ)

বেনেডিক্টের শপথ ঃ ষষ্ঠ শতকে পশ্চিম ইওরোপে মঠবাসীদের সংখ্যা এত বেড়ে যায় যে তাদের নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য কয়েকটি নিয়ম-কানুন চালু করা বিশেষ দরকার বলে মনে হয়। মন্টি ক্যাসিনো মঠের অধ্যক্ষ ছিলেন সেণ্ট বেনেডিক্ট। তিনি যুগের প্রয়োজনে এমন কয়েকটি নিয়ম-কানুন চালু করেন যেগুলি সব মঠই গ্রহণ করে। একটি রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে সংবিধানের যে গুরুত্ব—মঠজীবনের পক্ষে সেণ্ট্ বেনেডিক্টের নিয়ম-কানুনেরও প্রায় একই গুরুত্ব। ঐ নিয়ম অনুসারে প্রতি মঠের সন্ন্যাসীরা একজনকে মঠাধ্যক্ষ নির্বাচন করে বিনা দ্বিধায় তাঁর নির্দেশ মেনে



নান্

চলবেন। মঠবাসীদের তিনটি বিষয় মেনে চলতে হত—বৈরাগ্য,

শুচিতা, আনুগত্য। অর্থাৎ মঠবাসীরা ধন-সম্পত্তি গ্রহণ করবেন না—সরল জীবন কাটাবেন, বিবাহ না করে ধর্মের জন্য জীবন উৎসর্গ করবেন আর চার্চের ও অধ্যক্ষের নিয়ম মেনে চলবেন। পরে মঠবাসীদের মঠে যোগদানের আগে ঐ তিনটি বিষয়ে শপথ করতে হত। ঐ শপথ বেনেডিক্টের শপথ নামে পরিচিত।

মঠ-শিক্ষা-রক্ষাকর্তা ঃ মধ্য যুগে চার্চই ছিল একমাত্র সংস্থা যা জনগণকে শিক্ষা দিত। অবশ্য ঐ শিক্ষা ছিল (অজ্ঞতার) সমুদ্রে এক ফোঁটা বৃষ্টির মত। যাই হোক, মঠের সন্ন্যাসীরাই ছিলেন বহু দিন ধরে ইওরোপের লেখাপড়া জানা লোক। তাঁরা জনগণকে লিখতে পড়তে শেখাতেন; আর শিক্ষা দিতেন ব্যাকরণ, তর্কশাস্ত্র, গণিত, ধর্মতত্ত্ব, ভাষা প্রভৃতি। শিক্ষার বাহন ছিল দুরূহ লাটিন ভাষা। শিক্ষাদান ছাড়াও মঠের সন্ন্যাসীরা লাটিন ও গ্রীক ভাষায় লেখা প্রাচীন পুঁথিগুলি হাতে লিখে নকল করে রাখতেন। তাঁরা যদি কষ্ট করে ঐসব অতীতের সম্পদগুলি যত্ন করে রক্ষা না করতেন তাহলে পরবর্তীকালের মানুষ তাদের অতীতের গৌরব সম্পর্কে কিছুই জানতে পারত না। মধ্য যুগের শেষে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত মঠগুলিই শিক্ষা সম্পর্কে মানুষের আগ্রহ জাগিয়ে রাখে।

ক্লুনি-সংস্কার আন্দোলন ঃ দশম ও একাদশ শতকের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ক্লুনি-সংস্কার আন্দোলন। তোমরা জান যে ষষ্ঠ শতকে মঠগুলিকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য সেণ্ট বেনেডিক্ট কয়েকটি নিয়ম-কানুন রচনা করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে বিশেষতঃ শার্লামেনের সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে যাবার পর নানা কারণে মঠগুলিতে দুর্নীতি দেখা দেয়। যোগাযোগের কোন সুযোগ-সুবিধে না থাকায় মঠগুলির মধ্যে কোন সহযোগিতার মনোভাব এবং একতা থাকে না। মঠগুলিতে স্থানীয় ভাবধারার প্রভাব পড়ে মঠের শৃঙ্খলা নষ্ট হয়ে যায়। নর্সম্যানদের ও ভাইকিংদের আক্রমণ এবং লোভী সামন্তদের হস্তক্ষেপের ফলেও মঠের শৃঙ্খলা নষ্ট হয়। সামন্তদের সাহায্যে

বহু অযোগ্য ধর্মযাজক মঠের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হন, যাঁরা মঠের সম্পত্তিকে নিজেদের বিষয়-সম্পত্তি বলে মনে করতেন। মঠের সম্পত্তির অপব্যবহার চলতে থাকে। ঐ অবস্থা থেকে মুক্তি-লাভের জন্য সংস্কার প্রবর্তন অনিবার্য হয়ে পড়ে। সংস্কারে নেতৃত্ব দেয় বার্গাণ্ডির ক্লুনির মঠ। ঐ মঠটি ৯১০ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। মঠটি প্রথম থেকেই সকল প্রকার সামন্ততান্ত্রিক প্রভাব থেকে মুক্ত ছিল। পোপ ছাড়া অন্য কোন পার্থিব শক্তির অধীন ছিল না। সুতরাং অল্পদিনের মধ্যে ক্লুনির মঠটি মঠের স্বাধীনতার আদর্শ হয়ে দাঁড়ায়। অন্যান্য মঠগুলির ওপর ক্লুনির প্রভাব পড়তে থাকে। ক্লুনির আদর্শে বহু নতুন মঠও গড়ে ওঠে। ক্লুনির সংগঠন ছিল সরল ও কেন্দ্রীভূত। অল্পদিনের মধ্যে ক্লুনির প্রভাব পড়ে বার্গাণ্ডি ছাড়িয়ে ফ্রান্স, স্পেন, লোরেন, ইংলণ্ড, জার্মানী ও ইটালীতে। দ্বাদশ শতকে ক্লুনির অধীনে তিনশটি মঠ ছিল। ক্লুনির সংস্কার আন্দোলন বিশপ নির্বাচনের ক্ষেত্রে ধর্মজগতের বাইরের প্রভাব দূর করে। রাজা ও জমিদারদের সঙ্গে মঠ ও যাজকদের সম্পর্কেরও পরিবর্তন দেখা দেয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রতিষ্ঠাকরণ-প্রতিদ্বন্দ্বিতা

(Investiture Contest)

মধ্য যুগের ইওরোপের ইতিহাসের অন্যতম উল্লেখযোগ্য বিষয় প্রতিষ্ঠাকরণ-প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা ইনভেস্টিচার কনটেস্ট্। একাদশ শতকের শেষ ভাগ ও দ্বাদশ শতকে পবিত্র রোমক সম্রাটদের ও পোপগণের মধ্যে যে বিবাদ চলে তাকেই প্রতিষ্ঠাকরণ-প্রতিদ্বন্দ্বিতা বলা হয়। বিশপ ও যাজক নির্বাচনের সময় অনধিকারী ব্যক্তিদের (lay men) হস্তক্ষেপ ছিল ঐ বিবাদের প্রধান কারণ। বহু মঠাধ্যক্ষের বহু জায়গা-জমি ছিল। তাঁরা ধর্মের কাজও করতেন

আবার ধর্মের সঙ্গে সম্পর্ক নেই জমি-জমা সংক্রান্ত এমন অনেক কাজও করতেন। জমিদারদের নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্য যাজক বা বিশপ নির্বাচনের বিষয়ে আগ্রহ থাকা স্বাভাবিক।

১০৭৫ খ্রীস্টাব্দে এক ধর্মসভার পর পোপ সপ্তম গ্রেগরী এক নির্দেশনামা জারী করেন। ঐ নির্দেশনামায় অনধিকারী ব্যক্তিদের দ্বারা যাজক বা বিশপদের প্রতিষ্ঠাকরণ নিষিদ্ধ করা হয়। জার্মানীর রাজা ও পবিত্র রোমক সম্রাট চতুর্থ হেনরী বিরোধিতা করেন। চার্চে কার আধিপত্য থাকবে রাজার না পোপের?—এই প্রশ্নেই রাজা আর পোপের মধ্যে বিরোধ শুরু হয়।

রাজা বনাম পোপের দ্বন্দ্বের প্রথম পর্বে জয় হয় পোপের, তারপর জয় হয় রাজার আর তারপর ওয়ারমস্-এর ধর্ম মীমাংসায় শান্তি আসে।

১১২২ খ্রীস্টাব্দে সম্রাট পঞ্চম হেনরী ও পোপ দ্বিতীয় ক্যালিকস্টাসের মধ্যে এক ধর্মনৈতিক মীমাংসা হয়। বার্গাণ্ডি ও ইটালী ছাড়া জার্মানীতে সম্রাট তাঁর উপস্থিতিতে যাজক নির্বাচনের অধিকার পান।

রাজা বনাম পোপের দ্বন্দ্বের ফলে জার্মানীতে দেখা দেয় গৃহযুদ্ধ। রাজার ক্ষমতা হ্রাস পায়, অভিজাতদের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। উত্তর-ইটালীতে পোপের সমর্থনে লম্বার্ড সম্প্রদায়ের ক্ষমতা বৃদ্ধি আর সম্রাটের ক্ষমতা হ্রাস পায়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীর ইতিহাস

একাদশ ও দ্বাদশ শতকের পশ্চিম ইওরোপের ইতিহাস বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ঐ সময়ে বহু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করা হয়, বহু বিখ্যাত পণ্ডিতের আবির্ভাব হয়। আইন, চিকিৎসাবিদ্যা, ধর্মতত্ত্ব, তর্কশাস্ত্র, শিল্প ও সাহিত্যের প্রসার দেখতে পাওয়া যায়।

মধ্য-যুগের বিশ্ববিদ্যালয় :—তোমরা জান যে মধ্যযুগের প্রথম দিকে বিভিন্ন চার্চকে কেন্দ্র করে শিক্ষা-ব্যবস্থা চালু ছিল। চার্চগুলিই ছিল শিক্ষা ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। দ্বাদশ শতকে বিশ্ববিদ্যালয়-গুলি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর চার্চের বিদ্যালয়গুলির গুরুত্ব হ্রাস পায়। অবশ্য চার্চের কোন কোন বিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়।

লাটিন ইউনিভারসিটাস থেকে 'ইউনিভার্সিটি' (বিশ্ববিদ্যালয়) শব্দটির উৎপত্তি হয়। 'ইউনিভারসিটাস' বলতে ছাত্র ও শিক্ষকদের একত্র সমাবেশকে বোঝায়। যে বিদ্যালয়ে দেশ-বিদেশের ছাত্র পড়তে আসে তাকে বিশ্ববিদ্যালয় বলে।

নানা কারণে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি গড়ে ওঠে। মঠে ও গীর্জার বিদ্যালয়গুলিতে পড়ানো হত ধর্মের কথা, কিছু সাহিত্য আর ব্যাকরণ, ক্রমে আরও নানা বিষয়ে যেমন দর্শন, আইন, চিকিৎসা, রাজকার্য প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষার চাহিদা দেখা দেয়—বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সেই চাহিদা মেটে। কোন জায়গায় কোন বিখ্যাত আচার্যকে কেন্দ্র করেও বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে ওঠে। এখন তোমাদের মধ্যযুগের কয়েকজন বিখ্যাত পণ্ডিতের কথা বলছি। তাঁদের 'স্কুলমেন' বলা হত। স্কুলমেনদের মধ্যে প্রথমেই ফ্রান্সের অ্যাবেলর্ডের নাম উল্লেখ করতে হয়। তিনি প্যারী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনা করতেন। তাঁর মতে জ্ঞান লাভের প্রধান উপায় হল জিজ্ঞাসা। আগে প্রশ্ন তারপর বিশ্বাস। তাঁর মতবাদে চার্চের নেতাগণ বিব্রত বোধ করে তাঁর বিরুদ্ধে দুটি কাউন্সিল আহ্বান করেন। কাউন্সিলের নির্দেশে তাঁর কয়েকটি বই পুড়িয়ে দেওয়া হয়।

অ্যাবেলার্ডের পঞ্চাশ বছর পরে জার্মানীতে জন্মান অ্যালবার্ট ম্যাগনাম। পণ্ডিত হিসেবে তাঁর বিশেষ খ্যাতি ছিল। তাঁকে বলা হত 'দ্বিতীয় অ্যারিস্টটল'। তিনি প্যারী ও কালান বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন।

মধ্যযুগের স্কুলমেনদের মধ্যেও অ্যালবার্ট ও অ্যাকুইনাসের নাম উল্লেখ করতে হয়। তাঁরা ছিলেন গুরু ও শিষ্য। অ্যাকুইনাসের

লেখা বিখ্যাত বই 'ধর্মশাস্ত্রের নির্ঘণ্ট'। তিনি বিশ্বাসের সঙ্গে যুক্তির, ধর্মের সঙ্গে দর্শনের সামঞ্জস্য ঘটাতে চেয়েছিলেন।



অ্যাকুইনাস

রোজার বেকন ছিলেন জাতিতে ইংরেজ। তিনি অক্সফোর্ড ও প্যারীর অধ্যাপক ছিলেন। তিনি ছিলেন বৈজ্ঞানিক। চার্চের নেতারা তাঁর কথাবার্তা পছন্দ করতেন না। তিনি যন্ত্রের সাহায্য নিয়ে মানুষের অগ্রগতি সুনিশ্চিত একথা বলতেন। সেই অপরাধে তাঁর চোদ্দ বছর কারাদণ্ড হয়।

মধ্যযুগে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে **ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে সম্পর্ক** কেমন ছিল সেই কৌতূহলও নিশ্চয়ই তোমাদের মনে জাগছে? তোমাদের আগেই বলেছি, যে বিদ্যালয়ে দেশ-বিদেশ থেকে ছাত্ররা পড়তে আসত, শিক্ষকরা পড়াতে আসতেন সেই বিদ্যালয়কে বলা হত বিশ্ববিদ্যালয়। মধ্যযুগে এখনকার মত আগে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা পরে ছাত্রদের আগমন—এরকম নিয়ম ছিল না। অবস্থা ছিল আজকের দিনের ঠিক বিপরীত। যেমন কোন মঠে বা শহরে কোন নামকরা পণ্ডিত থাকতেন—তাঁর নাম শুনে দেশ-বিদেশ থেকে বহু ছাত্র এসে জড়ো হতেন—সেখানে বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠত। সেক্ষেত্রে ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে সম্পর্ক খুবই মধুর ছিল। আবার কখনও কখনও শিক্ষার উন্নতির জন্য ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকার রক্ষার জন্য কয়েকজন শিক্ষক জোট বাঁধতেন, ছাত্ররাও তাতে যোগ দিতেন সুতরাং এখানেও ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠ।

ছাত্র ও শিক্ষকরা অধিকাংশই বিদেশ থেকে আসতেন, বিদেশী বলে তাঁরা নানাপ্রকার অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিলেন—সেই কারণে অধিকার আদায়ের জন্য জোট বাঁধতে হত। ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয় সংঘ গঠন করত যেগুলি 'নেশন' নামে পরিচিত ছিল। শিক্ষকরাও কখনও কখনও নেশনে যোগ দিতেন। ভবিষ্যতে নেশনগুলি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির জন্য স্বায়ত্তশাসন আদায় করেছিল। তাদের খাজনা দিতে হত না, যুদ্ধে অংশ নিতে হত না, নিজেদের মধ্যে বিবাদ বিশ্ববিদ্যালয়েই মিটে যেত।

সেকালে একই বিশ্ববিদ্যালয়ে সব রকম বিষয় পড়ানো হত না। এক একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে এক একটি বিষয় পড়ানো হত। যার ফলে কোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন, কোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চিকিৎসাবিদ্যা, ধর্মশাস্ত্র বা তর্কশাস্ত্র প্রভৃতি এক একটি বিষয় প্রসার লাভ করে।



বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা

প্যারির বিশ্ববিদ্যালয় ছিল সেকালের শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়। সেখানে কোন বিষয় উচ্চতর ও নিম্নতর—দুই বিভাগেই পড়ানো হত। পরীক্ষায় সফল হলে উপাধি দেওয়া হত। উপাধি পাওয়ার পর শিক্ষকতা করাও চলত। ধর্মশাস্ত্র চর্চার জন্য প্যারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ খ্যাতি ছিল। পরে প্যারির আদর্শে অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ, ভিয়েনা, প্রাগ প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে ওঠে।

ইটালীর বোলোনা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল আইনশাস্ত্র শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে বিশেষ প্রসিদ্ধ। এখানে রোমক আইন ও অন্যান্য

আইন পড়ানো হত। ইটালীর অপর বিশ্ববিদ্যালয় ছিল সার্লাণো, চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য বিশেষ খ্যাতি ছিল। এটি ছিল ইটালীর সবচেয়ে পুরানো বিশ্ববিদ্যালয়। এগুলি ছাড়া আরও অনেকগুলি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল, কোথাও তর্কবিদ্যা আবার কোথাও বা বিজ্ঞান পড়ানো হত। ছাত্ররা প্যারিতে দু বছর, অক্সফোর্ডে একবছর—এরকম ঘুরে ঘুরেও নানা বিষয়ে শিক্ষালাভ করতেন।

সেকালে মনোযোগী ছাত্রদের খুব কষ্ট করে লেখাপড়া করতে হত। তখনও ছাপাখানা আবিষ্কার হয়নি, হাতে লেখা পুঁথির সংখ্যা ছিল খুব অল্প। লাটিন ছিল শিক্ষার বাহন। শিক্ষকরা বই থেকে পড়ে ব্যাখ্যা ও বক্তৃতা করতেন, ছাত্রদের তা লিখে নিতে হত।

চার্চ ও মঠের বিদ্যালয়গুলিতে প্রাচীন রোমের মত সাতটি বিষয় পড়ানো হত—যেগুলিকে **লিবারেল আর্টস** বলা হয়। ঐ সাতটি বিষয় ছিল—ব্যাকরণ, ছন্দ (rhetoric), তর্কশাস্ত্র, পাটীগণিত, জ্যামিতি, জ্যোতির্বিদ্যা ও সঙ্গীত। স্কুলমেনদের সময়ে ব্যাকরণ, ছন্দ ও তর্কশাস্ত্র—জ্ঞানের তিনটি পথ বা ট্রিভিয়াম (trivium) ও বাকী চারটি বিষয় কোয়াডরিভিয়াম (Quadvirium) নামে পরিচিত। বিভিন্ন গীর্জার পাথরে ঐ প্রকার বিভাগ লেখা থাকত। কিন্তু সকল মঠ বা গীর্জার বিদ্যালয়ে সাতটি বিষয়ই একসঙ্গে পড়ানো হত না। লাটিন ব্যাকরণ ও ছন্দ এবং অ্যারিস্টটলের তর্কশাস্ত্রের ওপর লেখা বই পড়ানো হত। দ্বাদশ শতকে বিভিন্ন মঠ ও গীর্জার বিদ্যালয়ে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে লিবারেল আর্টস বিষয়ক পড়াশোনার উপাদান বেড়ে যায়, তর্কশাস্ত্রে প্লেটোর রচনাবলী, ইউক্লিডের জ্যামিতি, প্লিনি ও টলেমির জ্যোতির্বিজ্ঞানের বই, আরবদের বিজ্ঞান বিষয়ে জ্ঞানের ব্যবহার শুরু হয়। দ্বাদশ শতকে যে সকল পণ্ডিতের কথা তোমাদের বলেছি তাঁদের রচনাগুলিও পড়ানো হতে থাকে। কিন্তু ঐ সময়ে বিভিন্ন বৃত্তিমূলক বিষয় পড়াশোনার ওপর বেশী আগ্রহ দেখা যায়।

মধ্যযুগে কলা ও সাহিত্যের জন্য কোন আলাদা পাঠ্যক্রম ছিল না। লাটিন ভাষায় লেখা বিভিন্ন বিষয়ে বই পড়ানো হলেও মাতৃভাষায় লেখা সাহিত্যেরও উন্নতি শুরু হয়। ফ্রান্সের ত্রাবাদুরগণ ও জার্মানীর মিনেসিংগারগণ মাতৃভাষায় চারণ গাথা রচনা করে গাইতেন। পরবর্তীকালে ইটালীর কবি দান্তে মাতৃভাষায় 'ডিভাইন কমেডি', ও ইংরেজ চসার ইংরেজীতে 'ক্যান্টারবেরির গল্প' লেখেন। সাহিত্যের প্রতি লোকের আগ্রহ বাড়তে থাকে।

অনুশীলনী

(ক) ১। শার্লামেনের রাজ্যবিস্তার সম্বন্ধে যা জান লেখ।

২। রোমক সাম্রাজ্যের কিভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হয়?

৩। শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকরূপে শার্লামেনের কি অবদান ছিল?

৪। মধ্যযুগে মঠ ও মঠবাসীদের জীবন-যাত্রা বিষয়ে আলোচনা কর।

৫। মঠ কিভাবে শিক্ষাকে রক্ষা করে?

৬। ক্লুনি-সংস্কা'র আন্দোলনের বিষয় আলোচনা কর।

৭। প্রতিষ্ঠাকরণ প্রতিদ্বন্দ্বিতার ইতিহাস লেখ।

৮। মধ্য যুগের বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে আলোচনা কর।

৯। মধ্য যুগের কয়েকজন 'স্কুলমেন' সম্পর্কে যা জান লেখ।

১০। মধ্য যুগে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক কেমন ছিল?

১১। মধ্য যুগের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় ও কি কারণে তাদের বিশেষ খ্যাতি ছিল সেই সম্পর্কে আলোচনা কর।

১২। লিবারেল আর্টস বলতে কি জান? ঐ বিষয়ের প্রসার সম্পর্কে লেখ।

(খ) **সংক্ষেপে উত্তর দাও ঃ**

১। ফ্রাঙ্কজাতির কি অবদান ছিল?

২। শার্লামেনের জীবনী-লেখক তাঁর সম্বন্ধে কি বর্ণনা করেছেন?

৩। শার্লামেনের রাজ্যাভিষেকের কি গুরুত্ব ছিল?

৪। শার্লামেনের রাজসভায় কয়েকজন পণ্ডিত সম্পর্কে আলোচনা কর।

৫। বেনেডিক্টের শপথ বলতে কি বোঝায়?

৬। কি কি কারণে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি গড়ে ওঠে?

৭। ‘নেশন’ কিভাবে গড়ে ওঠে ?

৮। মধ্য যুগের সাহিত্যের বিষয় উল্লেখ কর।

(গ) **মৌখিক প্রশ্নাবলী ঃ**

১। ফ্রাঙ্কদের সবচেয়ে বিখ্যাত রাজা কে ছিলেন ?

২। শার্লামেন অন্য কি নামে পরিচিত ছিলেন ?

৩। শার্লামেনের সমসাময়িক একজন বিখ্যাত শাসকের নাম বল ?

৪। শার্লামেন কত বছর রাজত্ব করেন ? ঐ সময়ে তাঁকে কতবার যুদ্ধ করতে হয় ?

৫। শার্লামেনের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে গিয়ে পোপ কি কাজ করে বসেন ?

৬। শার্লামেনের রাজধানীর নাম কি ছিল ?

৭। আইনহার্ড কে ছিলেন ?

৮। কার লেখায় শার্লামেনের রাজসভা সম্পর্কে সুন্দর বর্ণনা আছে ?

৯। সেন্ট্ বেনেডিক্ট কোন্ মঠের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ?

১০। ক্লুনির প্রতিষ্ঠা-কাল কত খ্রীস্টাব্দ ?

১১। কোন্ পোপের আমলে প্রতিষ্ঠাকরণ-প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয় ?

১২। অ্যালবেয়ার্ড কে ছিলেন ?

১৩। রোজার বেকন কে ছিলেন ?

১৪। ‘নেশন’ বলতে কি বোঝায় ?

১৫। প্যারি বিশ্ববিদ্যালয় কোন্ বিষয় পড়ানোর জন্য প্রসিদ্ধ ছিল ?

১৬। কোন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন পড়ানো হত ?

১৭। ‘মিনেসিংগার’দের দেশ কোথায় ছিল ?

———

সপ্তম অধ্যায়

মধ্য যুগে ফিউডাল প্রথা

উৎপত্তির ইতিহাস ঃ মধ্য যুগে ইওরোপের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল ফিউডাল বা সামন্ত প্রথা। নবম ও দশম শতকে পশ্চিম ইওরোপে ফিউডাল প্রথা ব্যাপকভাবে চালু হয়। কিন্তু সম্রাট শার্লামেনের রাজত্বকালের বহুদিন পূর্বেই সামন্ত প্রথার প্রচলন ছিল।

সামন্ত প্রথার হঠাৎ সৃষ্টি হয়নি, শত শত বছরের অরাজকতা আর কেন্দ্রীয় শাসনযন্ত্রের দুর্বলতার জন্য সামন্ত প্রথা এক এক দেশে এক এক রূপ নিয়ে গড়ে ওঠে। কিভাবে সামন্ত প্রথার সৃষ্টি হয়—সে কথা তোমাদের বলছি।

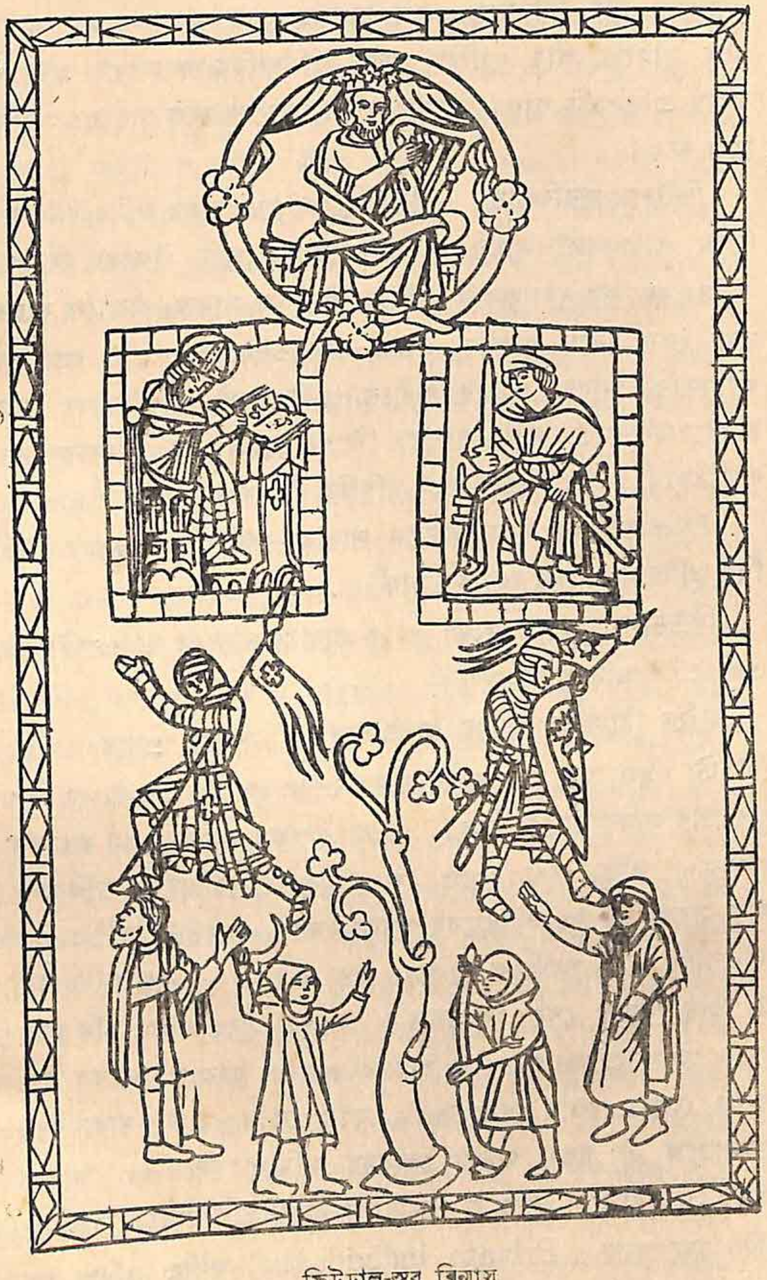
তোমরা হয়ত জান যে প্রাচীন গ্রীসে ও রোমে দাস প্রথার ওপর নির্ভর করে সভ্যতা গড়ে ওঠে। গ্রীক সমাজে কালক্রমে দাসেরা প্রধান আর্থিক অবলম্বন হয়ে ওঠে। গ্রীসের পতনের পর রোম সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে। নানাদেশ জয় করে রোমানগণ বন্দীদের দাসে পরিণত করে। ধন উৎপাদনের ব্যাপারে রোমান সাম্রাজ্যে দাস নিয়োগ শুরু হয়। দাসপ্রথার পূর্ণ বিকাশ দেখা যায় রোমান সাম্রাজ্যে। দাসদের চাষ-আবাদ, খনির কাজে, নানাপ্রকার হাতিয়ার তৈরী বা শিল্পবস্তু তৈরীর কাজে নিয়োগ করা হত। তোমরা শুনলে অবাক হবে যে রোমের শিক্ষার মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিও ছিল গ্রীক দাসদের হাতে। শেষে এমন অবস্থা দাঁড়ায় যে দাস ছাড়া রোমের জনজীবন একেবারে অচল। কিন্তু যে দাসদের শ্রমের ওপর নির্ভর করে রোমের সভ্যতা, অর্থনীতি গড়ে ওঠে—সেই দাসদের প্রতি অমানুষিক ব্যবহার করা হত, ফলে রোমান সাম্রাজ্যে বার বার দাসরা বিদ্রোহ করে। দাসরা জয়ী না হলেও ঐসব বিদ্রোহের ফলে রোমের সমাজ দুর্বল হয়ে পড়ে।

রোমান সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়ায় নতুন দেশ জয় করা আর যুদ্ধবন্দীদের দাসে পরিণত করা সম্ভব হয় না। দাস প্রথায় আর্থিক উন্নতিরও একটা সীমা ছিল। ধন উৎপাদনের পরিমাণ দাস সমাজে কমতে থাকে। রোমের ব্যবসা-বাণিজ্যও প্রায় বন্ধ হয়ে আসে। ঐ অবস্থায় বড় বড় জমিগুলিকে ছোট ছোট করে দাসদের মুক্তি দিয়ে ছোট ছোট চাষীতে পরিণত করে তাদের শ্রমে উৎপন্ন শস্যে ভাগ বসানো অনেক সুবিধেজনক বলে মনে হয়। এইভাবে ইওরোপে সামন্ত প্রথার সৃষ্টি হয়।

সামন্ত প্রথার সৃষ্টির আরেকটি কারণ হিসেবে বলা যায় যে, রোম সাম্রাজ্য ভেঙ্গে যাওয়ার পর ইওরোপের রাষ্ট্রীয় সংগঠন শিথিল হয়ে পড়ে। চারিদিকে দেখা দেয় অরাজকতা। প্রবল সুযোগ পেলেই দুর্বলের ওপর চালাত অত্যাচার, লুঠ-পাট। তাছাড়া উত্তর দিক থেকে নরম্যানরা, পূর্ব দিক থেকে হাঙ্গারিয়ানরা আর দক্ষিণ দিক থেকে আরবরা ইওরোপের শান্তি নষ্ট করতে থাকে। ঐ অশান্তি, উদ্বেগ আর অরাজকতার কিছুটা সমাধান হয় সামন্ত প্রথার মাধ্যমে।

নবম ও চতুর্দশ শতকের মধ্যবর্তী সময়কে সামন্ততন্ত্রের যুগ বলা হয়ে থাকে। সম্রাট শার্লামেনের মৃত্যুর পর যেমন তাঁর সাম্রাজ্য ভেঙ্গে যায়, আবার ঐ যুগেই সামন্ত প্রথার ব্যাপক প্রচলন শুরু হয়। পশ্চিম ইওরোপে সামন্ত প্রথা পূর্ণ রূপ নিয়ে দেখা দিলেও এশিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে সামন্ত প্রথার আগে থেকেই প্রচলন ছিল। এশিয়ার কোন কোন দেশে কিছুকাল আগে পর্যন্ত সামন্ত প্রথার অস্তিত্ব ছিল।

জমিকে কেন্দ্র করে মানুষে মানুষে বন্ধন : 'ফিউডাল' শব্দটির উৎপত্তি ফিউড (Feud) থেকে। ফিউডের প্রকৃত অর্থ প্রয়োজনে সাহায্য দানের শর্তে জমি ভোগ করা। জমি বণ্টনের মাধ্যমে সামন্ত প্রথার যুগে সমাজ গড়ে ওঠে। অরাজকতার যুগে প্রবল আর দুর্বলের মধ্যে চুক্তি হয়। সাধারণ মানুষ বা দুর্বল, প্রবলের কাছ থেকে



ফিউডাল-স্তর বিন্যাস

(রাজা ও সামন্তরা চাষীর শ্রমে নির্ভরশীল)

নিরাপত্তা চায় বিনিময়ে প্রবল দুর্বলের কাছ থেকে যুদ্ধের সময়ে যুদ্ধে সাহায্য আর শান্তির সময়ে জমিদারির কাজকর্মে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি পায়। সুতরাং জমিই মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক স্থির করে।

ফিউডাল স্তরবিন্যাসঃ রাজা ছিলেন দেশের সব জমির মালিক। তিনি শক্তিশালী সামন্ত বা জমিদারদের জমি ইজারা দিতেন, যাদের বলা হত মুখ্য ভূম্যধিকারী। ঐ সকল সামন্ত রাজাকে যুদ্ধের সময় সৈন্য দিয়ে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিতেন। বড় বড় জমিদাররা আবার তাদের অধীনে ছোট ছোট জমিদারদের সৈন্য সাহায্যের শর্তে জমি ইজারা দিতেন। ঐ সব জমিদার মধ্য ভূম্যধিকারী বা উপ-সামন্ত নামে পরিচিত ছিলেন।

উপ-সামন্তদের নীচে ছিলেন সাধারণ চাষী আর সকলের নীচে ছিল ভূমিদাস, যাদের বলা হত সার্ফ।

ফিউডাল ব্যবস্থায় রাজা আর সাধারণ মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হল এক শ্রেণীর অভিজাত সামন্ত।

ব্যক্তি বিশেষের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাভোগঃ সামন্ত প্রথার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল বড় বড় জমিদারদের প্রবল ক্ষমতা ভোগ যা ছিল **সার্বভৌম অধিকারের সামিল**। আগে ঐ রকম ক্ষমতা ভোগ করতেন রাজারা। সত্যি কথা বলতে কি সামন্ত প্রথায় জমির মালিকানা আর সরকারের মত জমিদারের ক্ষমতা ভোগ এমনভাবে জড়িত ছিল যে একটির থেকে অন্যটিকে আলাদা করা যায় না। কিন্তু জমিদাররা ঐ রকম ক্ষমতা পেল কি ভাবে? অনেক সময় রাজা যদি দুর্বল হতেন, তখন প্রবল জমিদার রাজার ক্ষমতা আর সরকারের আয় গায়ের জোরে ভোগ করতেন। কোন কোন রাজা বাধ্য হয়ে জমিদারকে ঐ রকম ক্ষমতা ভোগের অধিকার দিতেন। আবার অনেক সময় রাজারা উন্নত বা দক্ষ শাসন-ব্যবস্থা চালু রাখতে না পেরে ব্যক্তি বিশেষকে (Private individuals) অর্থাৎ জমিদারকে রাজনৈতিক ক্ষমতা ভোগের অধিকার দান করতেন। নর্স, ম্যাগিয়ার,

স্যারাসেন বা শ্লাভ-এর মত বহিরাগত আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যও রাজারা জমিদারদের রাজনৈতিক ক্ষমতা দিয়ে দিতেন। আবার অনেক অসাধু জমিদারও ছিল যাঁরা অরাজক অবস্থার সুযোগে নিজেদের ক্ষমতা বা জমির সীমা বাড়িয়ে নিতেন। অনেক সময় নতুন জমিদার হতেন আগেকার ডিউক, কাউণ্ট, ভাইকাউণ্টরা। সুতরাং সরকার বা রাজক্ষমতা ছিল যেন ব্যক্তিগত বিষয় (Private affair)। ব্যক্তিগত সম্পত্তির মত ঐ ক্ষমতা উত্তরাধিকারসূত্রে ভোগ করা চলত। স্থানীয় জমিদাররা রাজার ক্ষমতা ভোগ করতে থাকে ; কাউন্টি, ডাচি, মার্ক প্রভৃতি রাজ্যের অংশগুলি হয়ে উঠেছিল যেন এক একটি রাজ্য বিশেষ।

ইওরোপ প্রতিরক্ষায় সামন্তদের দুর্গ ও বর্মপরা ঘোড়সওয়ারদের ভূমিকা ঃ মধ্য যুগে পশ্চিম ইওরোপের ফিউডাল প্রথা আলোচনার সময় ঐ প্রথার নানারকম দোষ-ত্রুটি দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু ফিউডাল প্রথার নানারকম সঙ্কীর্ণতা ও অসুবিধে থাকা সত্ত্বেও ঐ প্রথার কিছু অবদানও ছিল। বহিরাগত শত্রুর আক্রমণ মোকাবিলার ক্ষেত্রে সামন্তদের দুর্গগুলি ও বর্মপরা ঘোড়সওয়ার যোদ্ধারা বিশেষ কৃতিত্ব দেখায়। ফ্রাঙ্ক্ সাম্রাজ্যে দুর্গ দিয়ে সুরক্ষিত জায়গা ছিল সংখ্যায় খুব অল্প। অবশ্য প্রতিরক্ষার কোন ব্যবস্থা ছিল না বললে ভুল বলা হবে। কিছু কিছু শহর ছিল যেখানে রোমানদের আমলের তৈরী প্রাচীর ছিল। ফ্রাঙ্ক্ শাসনকালে সেইগুলিকে বজায় রাখা হয়েছিল। ফ্রাঙ্করা সাধারণতঃ প্রতিরক্ষার জন্য উঁচু ঢিবি তৈরী করে তার চারদিকে খাল কেটে রাখত। কিন্তু ঐ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা যথেষ্ট ছিল না। দিনেমারদের আক্রমণের সময় রাজমিস্ত্রী দিয়ে তৈরী পাকা ও স্থায়ী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার গুরুত্ব বোঝা যায়। দিনেমারদের আক্রমণে যে সব শহর ধ্বংস হয় নি সেগুলিকে উঁচু দেওয়াল দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়। প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সর্বশ্রেষ্ঠ উপাদান ছিল সামন্তদের দুর্গ। ক্যাসল বা গৃহ দুর্গগুলি অনেক সময় পাহাড় বা উঁচু জমিতে তৈরী করা হত। অধিকাংশ ছিল পাথরের তৈরী। চারপাশে

খাল কেটে কাঠের সেতু দিয়ে যোগাযোগ রক্ষা করা হত। রাত্রে সেতু উঠিয়ে নেওয়া হত। দুর্গগুলি সামন্তদের আবাসকে নিরাপদ করে তোলে। দুর্গগুলি যুদ্ধের প্রকৃতিতে পরিবর্তন ঘটায়। বহিরাগত শত্রুর আক্রমণের সময় বহুলোক দুর্গে আশ্রয় নেয়। ঐ সময় দুর্গ অধিকারের কোন উপায় জানা ছিল না। একমাত্র উপায় ছিল দীর্ঘদিন ধরে দুর্গকে অবরোধ করে দুর্গের মধ্যে খাদ্যের অভাব ঘটিয়ে দুর্গবাসীদের ওপর চাপ সৃষ্টি করা। কিন্তু তিন মাসের আগে কোন দুর্গেই খাদ্যাভাব দেখা দিত না। আবার আক্রমণকারীদের পক্ষে সব সময় তিন চার মাস দুর্গ অবরোধ করে রাখাও সম্ভব ছিল না। দুর্গ যখন ছিল না তখন আক্রমণকারীরা খুব সহজেই লুঠ-পাট করতে পারত। কিন্তু দুর্গ তৈরীর পর ঐ কাজ সহজসাধ্য ছিল না। তাছাড়া কোন দুর্গের বাইরে তিন চার মাস অবরোধ করে বসে থাকলে দেশের অন্যান্য জায়গা থেকে আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে মিলিত বাধাদানেরও সম্ভাবনা ছিল।


ফিউডাল দুর্গ (ক্যাসল)

বহিরাগত আক্রমণ থেকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে দুর্গগুলির মত বর্ম-পরা ঘোড়সওয়ারদের অবদানও কম ছিল না। ইওরোপের বিভিন্ন অংশে বহিঃশত্রুদের লক্ষ্য ছিল খুব অল্প সময়ের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে লুঠ-পাট করা। ঐ প্রকার শত্রুর আক্রমণ মোকাবিলার জন্য প্রয়োজন ছিল গতির। পদাতিক সৈন্যদের পক্ষে ঐ প্রয়োজন মেটানো সম্ভব

ছিল না। কিন্তু ফিউডাল যুগে বর্ম পরা ঘোড়সওয়ার সেনারা সংখ্যায় অল্প হওয়া সত্ত্বেও আক্রমণকারী শত্রুর বিরুদ্ধে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। সংখ্যায় অল্প থাকার জন্য সরাসরি যুদ্ধে জয়লাভ না করেও অপরিসর জায়গায় শত্রুদের অসুবিধে করা বা শত্রুদের মধ্যে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করতে তাদের কোন অসুবিধে হয় না।

ফিউডাল যুগের জীবনযাত্রাঃ সামন্ত প্রথার যুগে সামন্ত বা জায়গীরদারগণ ছিলেন সমাজে সবচেয়ে শক্তিশালী। তারা গৃহ-দুর্গ বা ক্যাসলে বাস করতেন। জীবিকার জন্য তাঁদের কোন পরিশ্রম করতে হত না। আশ্রিত চাষী-প্রজাদের ঘাড়ে ভর দিয়ে তাঁরা নির্ভাবনায় দিন কাটাতেন। তাঁরা নিজস্ব সৈন্য রাখতেন প্রয়োজনে ওপরওয়ালাকে বা রাজাকে সৈন্য সাহায্য করতেন। সামন্তরা প্রয়োজনে যুদ্ধ করতেন। অবসর সময় কাটাতেন শিকার করে। ভোজের সময় একটি আস্ত ষাঁড় বা শূকর পোড়ানো হত। তাঁরা ভাট-চরণের স্তুতি গান শুনতেন, মল্লবীরদের কসরৎ দেখতেন বা মাইনে করা ভাঁড়দের ভাঁড়ামো দেখে হাসি-ঠাট্টা করেও অবসর কাটাতেন। অনেক সময় তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ রাজার মত বা রাজার চেয়ে শক্তিশালী হয়ে উঠতেন। অবশ্য সামন্তদের সকলের অবস্থা সমান ছিল না। আবার সামন্ত পরিবারের সকলেই যে জমিদার ছিলেন তাও নয়। ঐ সব সামন্তের সন্তানরা 'নাইট' হওয়ার জন্য ছোটবেলা থেকে তৈরী হতেন। নাইট হওয়া ছিল খুবই সম্মানের ব্যাপার। নাইটের ধর্ম ছিল সকল প্রকার অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। কিন্তু নাইট হওয়া খুব সহজ ছিল না। যে সব সামন্তের অবস্থা তেমন ভাল ছিল না—এই



নাইট

রকম সামন্তের ছেলেকে মাত্র সাত বছর বয়সে কোন প্রভুর 'পেজ' বা বালক ভৃত্য হিসেবে প্রভুকে সেবা করতে হত। ধর্মনীতি ও আচার-আচরণ সম্পর্কে এই সময়ে তাকে শিক্ষা দেওয়া হত। লেখা-পড়ার কোন ব্যবস্থা ছিল না সামন্তদের সমাজে। চোদ্দ বছর বয়সে ঐ বালক হত 'স্কোয়ার' বা প্রভুর অনুচর। তাকে প্রভুর হাতিয়ার প্রয়োজনে যুদ্ধক্ষেত্রে বহন করে নিয়ে যেতে হত। চোদ্দ থেকে একুশ বছর বয়সের মধ্যে তাকে যুদ্ধ-বিদ্যা ও অস্ত্রবিদ্যা আয়ত্ত করতে হত। একুশ বছর বয়সে স্কোয়ার হত নাইট। আনুষ্ঠানিকভাবে নাইট হওয়ার আগে স্কোয়ার অনুষ্ঠানের দিন উপবাসী থেকে আর রাত্রি জেগে কাটিয়ে প্রভুর কাছে নাইটের বীরধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ শুনত। তারপর তাকে নতজানু হয়ে আজীবন খ্রীস্টান ধর্ম, নারীর সম্মান, বিপন্নকে উদ্ধার ও সাথী নাইটদের প্রতি বিশ্বস্ত থাকার জন্য শপথ নিতে হত। তারপর প্রভু তাকে অস্ত্রেশস্ত্রে সাজিয়ে বলতেন যে 'ঈশ্বরের নামে আমি তোমাকে নাইট করলাম। তুমি বীর, নির্ভয় ও প্রভুর অনুগত হও।'

শিভ্যালরি ঃ 'শিভ্যালরি' বলতে নাইটদের আচরণের আদর্শকে বোঝাত। শিভ্যালরি ছিল একটি মহান আদর্শ, সেবা, মহানুভতা, ভদ্রব্যবহার, অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ছিল শিভ্যালরির অংশ। মধ্যযুগের নাইটগণ ধর্ম ও নারীর সম্মান রক্ষার জন্য নিজের জীবন দান করতেও কুণ্ঠিত হতেন না। ঐ সকল আদর্শের জন্য নাইটরা তাঁদের সময়কার সাধারণ মানুষের কাছ থেকে পেয়েছিলেন সম্মান ও শ্রদ্ধা আর স্থাপন করেছিলেন এক মহান ও উদার আদর্শ। সারা অঙ্গে লোহার বর্ম পরে, হাতে লোহার দস্তানা ও পায়ে আঁটা মোজা পরে ঘোড়ার পিঠে চেপে এক হাতে ঢাল আর অন্য হাতে তলোয়ার বা বর্শা নিয়ে নাইট যুদ্ধ করতেন। কোন নাইটের আচরণে যদি বিশ্বাসঘাতকতা বা ভয় প্রকাশ পেত তাহলে তার তলোয়ার ভেঙ্গে দিয়ে, বর্ম কেড়ে নিয়ে তাকে নাইট সম্প্রদায় থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হত।

টুর্ণামেণ্ট ও শিকার ছিল নাইটদের অত্যন্ত প্রিয়। বর্ম পরে, ঘোড়ায় চেপে অস্ত্র নিয়ে নাইটরা দর্শকঘেরা প্রাঙ্গণে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতেন। যে ঘোড়া থেকে পড়ে যেত—তাকে পরাজিত বলে ধরে নেওয়া হত। বিজয়ীকে সোনার মুকুট, মালা প্রভৃতি দিয়ে সম্মান দেখানো হত।

ট্রাবাডুর ঃ আমাদের দেশের যেমন চারণ-কবিরা ছিলেন সেই রকম মধ্যযুগে বীরত্বপূর্ণ কাহিনী নিয়ে চারণ কবিরা গান বাঁধতেন আর গেয়ে বেড়াতেন। দ্বাদশ শতকে দক্ষিণ ফ্রান্সে এক শ্রেণীর চারণ-কবির আবির্ভাব হয় যাঁদের বলা হত ট্রাবাডুর। তাঁরা ফরাসী ভাষায় রাজা আর্থার ও তাঁর বিখ্যাত নাইটদের কাহিনী নিয়ে গান বেঁধে গাইতেন। তাছাড়া গাইতেন শার্লামেন ও তাঁর বিখ্যাত সেনাপতি রোল্যাণ্ডের আত্মত্যাগের কথা। প্রাচীন গ্রীসের মহাকাব্য ইলিয়াডের বিষয়বস্তু ট্রয়ের যুদ্ধ ও ম্যাসিডনরাজ আলেকজাণ্ডারের দিগ্বিজয়কে কেন্দ্র করেও ট্রাবাডুরগণ অনেক চারণ-গান রচনা করে গাইতেন। জার্মানীর চারণ-কবি মিনেসিংগারদের সময় থেকে যেমন জার্মান সাহিত্যের সূত্রপাত হয় তেমনি ফরাসী চারণ-কবি ট্রাবাডুরদের অবদানে ফরাসী কথ্য ভাষার সাহিত্যের প্রচলন ও ক্রমশঃ উন্নতি হয়।

দ্বিতীয় পর্ব

ম্যানর প্রথা

তোমরা সামন্তপ্রথার কথা জেনেছ। এখন তোমাদের সামন্ত-প্রথার অন্যদিক—অর্থাৎ ম্যানর প্রথা সম্বন্ধে বলছি। ফিউডালপ্রথার মতই পুরানো ম্যানর প্রথা। রোমান আর জার্মান—দুই জাতির ম্যানর প্রথার যথেষ্ট অবদান ছিল। রোম সাম্রাজ্যের শেষদিকেই অভিজাত ভূস্বামীদের উত্থানের লক্ষণ দেখা দেয়। রোম সাম্রাজ্যের

দুর্বলতার সুযোগে জার্মানদের বসতিস্থাপন আর নবম শতকের বিশৃঙ্খলা অভিজাত ভূস্বামীদের উত্থানকে সুনিশ্চিত করে।

রোমান ভিলাগুলি থেকে কতকগুলি ম্যানরের উৎপত্তি হয়। আবার জার্মান গ্রাম থেকেও কয়েকটি ম্যানরের সৃষ্টি হয়। রোমান ভিলার ব্যক্তি বিশেষ মালিকানা প্রথার দ্বারা জার্মান গ্রাম প্রথা প্রভাবিত ছিল।

শহর থেকে গ্রামে খ্রীস্টধর্ম প্রসার লাভ করার ফলেও ম্যানর প্রথা প্রসারিত হয়। গ্রামের গীর্জাগুলির অনেক চাষের জমি ছিল। রাজনৈতিক আর অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে ম্যানর প্রথাকে ফিউডাল বা সামন্তপ্রথার অংশ বলা চলে। ম্যানর প্রথা ছিল ফিউডাল প্রথার অর্থনৈতিক অংশ বিশেষ।

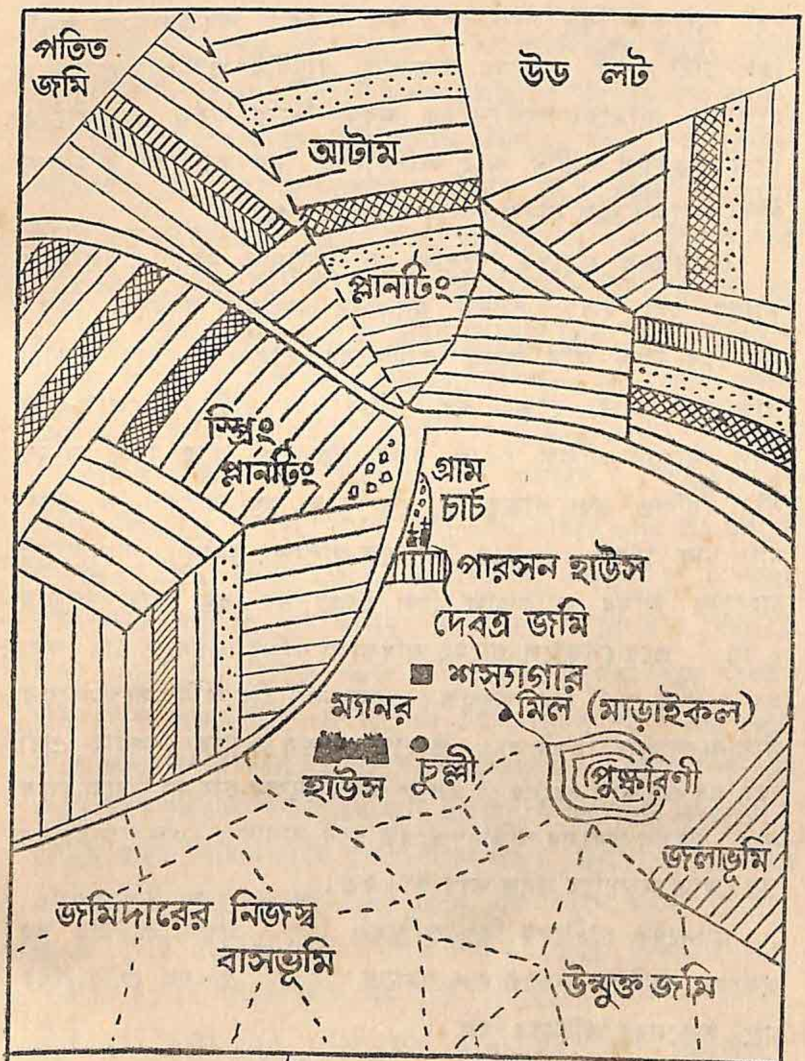
মধ্যযুগে গ্রামের এক ধরণের লোকের শ্রমের ভিত্তিতে জমি চাষ-বাসের যে বন্দোবস্ত ছিল—তাকেই ম্যানর প্রথা বলা যায়।

ম্যানর ছিল ফিউডাল আমলের সরকারের একটি স্থানীয় সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান। ম্যানর ছিল একটি গ্রাম বা বড় ম্যানরে একাধিক গ্রামের অস্তিত্ব ছিল।

ম্যানরের গ্রামে ছিল ম্যানর কোর্ট। ঐ সব ম্যানর কোর্টের মাধ্যমে জমিদার বা লর্ড তাঁর প্রজাবর্গ অর্থাৎ চাষীদের ওপর তাঁর রাজনৈতিক আর সম্পত্তিগত অধিকার প্রয়োগ করতেন। ম্যানর কোর্ট বসত পল্লীর গীর্জায়, বা ম্যানরের হলঘরে কিংবা গাছের নীচে।

ম্যানরের চাষীদের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের ওপর ভিত্তি করে মধ্য যুগের অর্থনৈতিক বনিয়াদ গড়ে ওঠে। মধ্য যুগের সমাজ ছিল কৃষির ওপর নির্ভরশীল।

অভিজাতরা বা সুবিধাভোগীরা শিকার করে, যুদ্ধে অংশ নিয়ে, বা দুর্গ কিংবা গীর্জা তৈরী করিয়ে সময় কাটাতেন আর তার খরচ যোগান দিত চাষীরা জমিতে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে। মধ্য যুগ সম্বন্ধে ভালো ভাবে জানতে গেলে ম্যানর প্রথা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা বিশেষ দরকার।



একটি আদর্শ ম্যানর

ম্যানর প্রথায় অর্থনৈতিক অবস্থা কেমন ছিল? কৃষিকে ভিত্তি করে অর্থনৈতিক অবস্থা গড়ে উঠেছিল। সামন্তদের সংখ্যা ছিল খুবই অল্প, আর কিছু লোক শহরে বাস করত। শতকরা ৯৫ জনই ছিল চাষী। ঐ চাষীদের হাড়ভাঙ্গা খাটুনীর ওপর সামন্ত প্রথার যুগে বা ম্যানরের অর্থনৈতিক অবস্থা নির্ভর করত। চাষীদের মধ্যে কিছু ছিল স্বাধীন আর অধিকাংশই ছিল সার্ফ বা ভূমিদাস, তারা সকলেই ছিল সামন্ত কিংবা জমিদারের প্রজা।

তোমাদের আগেই বলেছি যে ফিউডাল যুগে গ্রামগুলিকে ম্যানর বলা হত। প্রতিটি ম্যানরের একজন জমিদার ছিল। ম্যানরের কিছু জমি থাকত জমিদারের খাসদখলে আর বাকীটা প্রজাদের ইজারা দেওয়া হত। প্রজা বা চাষীদের জোত-জমি ছিল আলাদা—কিন্তু কোন রকম বেড়া বা আল দিয়ে জমির সীমা চিহ্নিত করা থাকত না, সে যুগে রড নামে এক রকম মাপ চালু ছিল। ৪০ রড ছিল এক ফার্লংএর সমান। সাধারণতঃ চাষীদের জমির ফালিগুলি ছিল লম্বায় ৪০ রড আর চওড়ায় ৪ রড। তবে সেকালে গ্রামের অধিকাংশ জমিই একসঙ্গে চাষ করা হত। চাষ-প্রথা ছিল অনুন্নত। একজন চাষীর জমির সঙ্গে অন্যের সীমানা স্পষ্টত ছিলই না। তাছাড়া লাঙল ও সার দেওয়ার প্রথা ছিল খুব সেকেলে ধরণের। সকলে একই শস্যের চাষ না করলে চলত না। উৎপন্ন ফসলের পরিমাণও হত খুবই সামান্য। একসঙ্গে চাষের পর জোত অনুসারে ফসল ভাগ করা হত।

ম্যানরের চাষীদের কিছু সুবিধেও ছিল। ফসল কাটবার পর সকলের জমিতে সকলে গরু চরাতে পারত। গ্রামের গোচারণের মাঠে সকলেরই অধিকার ছিল।

ম্যানর প্রথায় চাষীদের প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে হত। জমিদারের কাছ থেকে যে জমি ইজারা নিত তার খাজনা হিসেবে জমিদারের বাড়িতে গিয়ে খেটে কিংবা জমিদারের খাস জমিতে চাষ করে খাজনা শোধ করতে হত। জমিদারের জমি চাষ করতে হত।

জমিদারের গরু-ভেড়ার যত্ন, জমিদারের রাস্তাঘাট সারানো ঐ সব কাজ করে চাষীদের আর নিজের জমি দেখা-শোনা করার মত সময় মিলত না।

চাষীদের শ্রমের কথা শুনলে। এবার চাষীদের অবস্থা কেমন ছিল আর কি ভাবে তারা করভারে জর্জরিত ছিল সে কথা বলছি। মধ্য যুগে চাষীদের জীবন ছিল অত্যন্ত করুণ। মধ্য যুগের সাহিত্যে অভিজাত আর বুর্জোয়া শ্রেণীর চাষীদের প্রতি সদম্ভ ব্যবহারের বিষয় উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। অভিজাতরা ছিল শোষকশ্রেণী আর চাষীরা ছিল শোষিত। কোন কোন লেখায় চাষীদের বলা হয় যে তারা গরু-মোষের সামিল। চাষীদের মাথা ছিল নিরেট, বুদ্ধিহীন মগজে কোন কিছু ঢুকত না। এই ধরণের আরও বহু অপমানজনক উক্তি চাষীদের সম্বন্ধে মধ্য যুগের সাহিত্যে স্থান পেয়েছিল।

ম্যানর প্রথায় চাষী ছিল করভারে জর্জরিত। ফিউডাল যুগে নিয়ম ছিল যে জমিদার তার ইচ্ছানুযায়ী চাষীর ওপর কর বসাতে পারেন। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রথা অনুসারে ম্যানরের জমিদারকে চাষীকে যে খাজনা দিতে হবে তার হার নির্ধারিত হত। চাষী জমিদারকে শস্যে অথবা টাকায় খাজনা দিতে পারত। খাজনার হার এক দেশ থেকে অন্য দেশে, একই দেশের এক জেলা থেকে অন্য জেলায় এমন কি এক ম্যানর থেকে অন্য ম্যানরে ভিন্ন ভিন্ন হত। তবে সব দেশেই চাষীকে জমি ইজারা নেওয়ার জন্য জমিদারকে বার্ষিক একটা নির্দিষ্ট হারে খাজনা দিতে হত। ফ্রান্সে পরে টেইলি নামে চাষীর ওপর সরাসরি একপ্রকার কর বসানো হয়। তাছাড়া নানা বিষয়ে চাষী জমিদারকে শস্য দিত। প্রথমে ঐগুলি স্বেচ্ছায় দেওয়া হত পরে বাধ্যতামূলক হয়ে পড়ে। চাষী জমিদারকে নজরানা দিত আর চাষী মারা গেলে তার উত্তরাধিকারীদের জমিদারকে ইজারার উত্তরাধিকারের জন্য খাজনা দিতে হত।

কিন্তু এখানেই শেষ নয়, চাষীকে জমিদারের রাস্তায় চলার জন্য, সাঁকোয় চড়ার জন্য কর দিতে হত। জমিদারের জাঁতাকলে পয়সা

দিয়ে গম ভাঙ্গাতে হত। চাষীর নিজের ঘরে কোন উনুন বা চুল্লী ছিল না। জমিদারের চুল্লীতে রুটী সেঁকতে হত আর তার জন্যও জমিদার পয়সা আদায় করতেন চাষীদের কাছ থেকে। জমিদারের চাষীর ওপর শোষণের কোন সীমা ছিল না। চাষীর কাছ থেকে নানারকম কর আদায় করে, চাষীকে জমিদার নিজের বাড়ির কাজে আর ক্ষেত-খামারে বিনা পয়সায় কাজ করিয়ে নিয়েও জমিদারের আশ মিটত না। চাষীকে জঙ্গলে শিকার করা বা কাঠ কুড়ানোর বা নদী ও পুকুরে মাছ ধরার অধিকারও দেওয়া হত না।

চাষীর ওপর শুধু জমিদারের শোষণ ছিল না, চার্চও একইভাবে শোষণ করত। চাষী চার্চকে ধর্ম কর দিত। চার্চকে কর না দিলে—তার বদলে চাষীর ঘরের সেরা আসবাব বা সবচেয়ে সেরা গরু-ভেড়া দিয়ে দিতে হত।

তোমরা নিশ্চয়ই মনে মনে ভাবছ যে জমিদারকে ও চার্চকে অতরকম কর দিয়ে চাষীর দিন চলত কি করে? সত্যিই চাষীর দিন কাটানো ছিল নিতান্তই কষ্টকর। ছোট ম্যানরে বার থেকে পনেরটা আর বড় বড় ম্যানরে পঞ্চাশ থেকে ষাটটা চাষীর পরিবার বাস করত। চাষীরা বাস করত ছোট কাঠের ঘরে। ঘরে কোন জানলা থাকত না, চিমনি ছিল না, ধোঁয়া যাতে ঘর থেকে বাইরে যায় সেজন্যে ছাদের মাঝে গর্ত করা থাকত। আবার ঐ গর্ত দিয়ে ঘরে বর্ষার জল বা শীতের বরফও ঢুকত। ঐ সব কারণে চাষীর ঘরের মেঝে ছিল স্যাঁতস্যাঁতে আর পিচ্ছিল। রাত্রে কোন আলো জ্বালানোর সংগতি চাষীর ছিল না। মোমবাতি জ্বালানোর চিন্তা ছিল চাষীর কাছে বিলাস। চাষী লিখতে পড়তে জানত না। সূর্যোদয়ে ঘুম থেকে ওঠা আর সূর্যাস্তের পর শুয়ে পড়া—এই ছিল চাষীদের দিন কাটানোর রীতি। চাষীর ঘরে বিছানা বলতে ছিল কাঠের বাক্স—তার নীচে খড় বা শুকনো পাতা বিছানো। আসবাব বলতে তিন পায়া কাঠের টুল, আলমারি, আর কয়েকটি লোহার ও মাটির বাসন। গরমকালে চাষীর বউ ঘরের বাইরে কাঠকুটো জ্বেলে রান্না করত

কিন্তু ম্যানরে জমিদার ছাড়া কারও উনান থাকত না। চাষীর ঘরে চাষীর সঙ্গে বিড়াল, কুকুর, মুরগী—একই সঙ্গে বাস করত। এক ফালি জমি ছাড়া চাষীর সম্পদ বলতে থাকত কয়েকটা বলদ, দু একটা গরু ও শূকর। অবস্থাপন্ন চাষীর ঘোড়া থাকত। খাওয়া ছিল নিরামিষ, কালো রুটি আর উৎসবে বিয়ার জাতীয় পানীয়। ঘরের লাগোয়া বাগানে চাষী ফল-সবজী ফলাতো। মাংস জুটত না। অবস্থাপন্ন চাষীর বাড়ি ছিল পাথরের কিন্তু অবস্থাপন্ন চাষী ছিল না বললেই চলে। চাষীদের আমোদ প্রমোদ বলতে পল্লী গীর্জায় বা গ্রামের মেলায় সমবেত হয়ে আনন্দ করা।

চাষীর পরিবারের মেয়েরাও খুব পরিশ্রম করত। মেয়ে পুরুষ সকলে সুতি, পশম ও চামড়ার পোশাক পরত। মেয়েরা সুতো কাটত আর কাপড় বুনত।

বড় বড় ম্যানরগুলোয় 'ক্যাসল' বা গৃহ দুর্গ ছিল। আর ছোট বড় সব ম্যানরেই ছিল পল্লীর গীর্জা। মধ্য যুগের সাধারণ সমাজ-ব্যবস্থার মতই ছিল ম্যানরের সমাজ-ব্যবস্থা বা সামাজিক বিভাগ। সামাজিক বিভাগ ছিল কঠোর। সমাজ তিনটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। প্রথম সম্প্রদায় ছিল যাজকগণ, দ্বিতীয় সম্প্রদায় ছিল অভিজাতগণ আর তৃতীয় সম্প্রদায় বলতে যাজক ও অভিজাত ছাড়া বাকী সকলকে বোঝাত। প্রথম সম্প্রদায় অর্থাৎ যাজকদের কাজ ছিল ধর্মানুষ্ঠান, দ্বিতীয় সম্প্রদায় অর্থাৎ অভিজাতদের কাজ ছিল শাসন পরিচালনা আর সমাজকে প্রতিরক্ষা দেওয়া, আর তৃতীয় সম্প্রদায়ের কাজ ছিল দিন রাত হাড়ভাঙ্গা খাটুনির ফল দিয়ে প্রথম দুই সম্প্রদায়ের রসদ যোগানো। কোন রকম পরিশ্রম না করে সামন্ত বা অভিজাতরা কিভাবে ভোগ-বিলাসে দিন কাটাত—সে কথা তোমরা ফিউডাল যুগের জীবনযাত্রা প্রসঙ্গে আগেই জেনেছ।

আর যাজকরা ছিল অধিকাংশই সামান্য শিক্ষিত। কিছু লাটিন পড়তে আর বলতে পারতেন। দুই একজন সাধু-পুরুষের জীবন-কথা পাঠ করা ছাড়া খুব বেশী বিদ্যে-বুদ্ধি তাদের ছিল না। কিন্তু তাঁরাই

সবচেয়ে বেশী শিক্ষিত বলে সাধারণ মানুষের কাছে সম্মান আদায় করতেন আর মজায় দিন কাটাতেন। অনেক চার্চের এত চাষের জমি ছিল যে ঐ সব চার্চের যাজকরা ছিলেন বড় বড় জমিদারের সামিল। যাজক বা বিশপদের নীচে থাকতেন সাধারণ পাদরিগণ। মধ্য যুগে চার্চই ছিল সবচেয়ে বড় জমিদার। সামন্তদের মত যাজক ও বিশপরাও ছিল শোষক। তারা ধর্মের নামে সাধারণ মানুষের ওপর শোষণ চালাত।

তোমরা চাষীদের কথা জেনেছ। জেনেছ তাদের করুণ কাহিনী। কি অন্যায় শোষণই না চালানো হত তাদের ওপর! ঐ চাষীদের মধ্যে খুব অল্পসংখ্যক ছিল স্বাধীন আর বেশী ভাগই ছিল সার্ফ বা ভূমিদাস। ভূমিদাস সেকালের রোমের ক্রীতদাসের মত ছিল না। কিন্তু ভূমিদাসের ম্যানর ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাবার স্বাধীনতা ছিল না। ভূমিদাস ছিল যেন প্রভুর অস্থাবর সম্পত্তি। ভূমিদাস প্রভুর গরু ভেড়ার চেয়ে উন্নত কোন জীব ছিল না। জমি হাত বদল হলে গাছ-পাথরের মত ভূমিদাসের মালিকানাও বদল হত। ভূমিদাস অপর এক ভূমিদাসের বিরুদ্ধে কোর্টের সাহায্য নিতে পারত কিন্তু কোন স্বাধীন লোকের বিরুদ্ধে আইনের আশ্রয় নিতে পারত না।

ভূমিদাসকে বিয়ে করতে গেলে প্রভুকে টাকা দিয়ে তাঁর অনুমতি নিতে হত। ভূমিদাসকে প্রভুর বাড়ির কাজে, চাষের জমিতে, রাস্তা তৈরীর কাজে বেগার খাটতে হত। প্রভু ও চার্চকে নানাভাবে কর দিয়ে তাকে অত্যন্ত বেদনাময় জীবন কাটাতে হত। ভূমিদাসের ছেলেও হত ভূমিদাস। নিশ্চয়ই তোমাদের মনে প্রশ্ন জাগছে যে ভূমিদাসদের মুক্তির কি কোন উপায় ছিল না? কিছু কিছু উপায় ছিল যা ভূমিদাসকে মুক্তি দিত। এখন তোমাদের সে প্রসঙ্গে বলছি। কোন ভূমিদাস যদি তার প্রভুর অনুমতি নিয়ে ধর্মযুদ্ধে অংশ নিত তাহলে সে আর ভূমিদাস থাকত না। তাছাড়া ভূমিদাসের কাছে মুক্তির আরও উপায় ছিল। ভূমিদাস ম্যানর থেকে পালিয়ে

শহরে গিয়ে আশ্রয় নিতে পারত। শহরে ব্যবসা-বাণিজ্যে বা শিল্পের কাজে নিযুক্ত হলে তার মুক্তি মিলত। পলাতক ভূমিদাসকে চিরদিনের জন্য হারিয়ে গেছে—এরকম ভাবা হত। একজন ভূমিদাস ম্যানর থেকে পালিয়ে যেখানে নতুন বসতি স্থাপন করা হচ্ছে সেরকম জায়গায় চলে গেলেও মুক্তিলাভ করত। ভূমিদাস বিদ্রোহ করলে বা বিদ্রোহ করার ভয় দেখিয়েও মুক্ত হতে পারত। ঐ সময় কৃষি-বিদ্রোহে জমিদাররা ভীত হয়েছিল। কারণ ভূমিদাসদের বিদ্রোহ দমন করা হলেও অনেক সময় শহর বা গ্রামের জনমত ভূমিদাসদের পক্ষে গিয়েছিল। অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এক সময় ভূমিদাস প্রথা জমিদারদের কাছে আগের মত লাভজনক মনে হত না। ভূমিদাসদের মুক্তির পথ দেখা দেয়।

অনুশীলনী

(ক) ১। পশ্চিম ইওরোপে সামন্ত প্রথার উৎপত্তির ইতিহাস লেখ।

২। সামন্ত দুর্গগুলি ও বর্মপরা ঘোড়সওয়ারগণ ইওরোপকে কিভাবে রক্ষা করে?

৩। সামন্ত প্রথার যুগে সামন্তদের জীবনযাত্রার বিষয় যা জান লেখ।

৪। নাইট্ ও শিভ্যালরি সম্বন্ধে আলোচনা কর।

৫। ম্যানর কি? ইওরোপে কিভাবে ম্যানর প্রথার উৎপত্তি হয়?

৬। ম্যানরের চাষীদের অবস্থার বিবরণ দাও।

৭। ম্যানরের প্রথায় চাষীরা কিভাবে শোষিত হত?

৮। 'ভূমিদাস' বলতে কি বোঝায়? কি কি উপায়ে ভূমিদাসরা মুক্তি পেত?

(খ) **সংক্ষেপে উত্তর দাও:**

১। সামন্ত প্রথায় জমির গুরুত্ব সম্পর্কে লেখ।

২। ফিউডাল-স্তরবিন্যাস সম্পর্কে আলোচনা কর।

৩। সামন্ত প্রথায় ব্যক্তিবিশেষ কিভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ভোগ করতে থাকে?

৪। অভিজাত ব্যক্তির ছেলে কিভাবে নাইট হত ?

৫। ট্রাবাডুরদের সম্পর্কে আলোচনা কর।

৬। ভূমিদাস ও চাষীদের কি কি কর দিতে হত ?

৭। ফিউডাল যুগে যাজকদের সম্পর্কে আলোচনা কর।

(গ) মৌখিক প্রশ্নাবলী :

১। কোন্ সময়কে 'সামন্ত প্রথার যুগ' বলে ?

২। কোন্ শব্দ থেকে ফিউডাল শব্দের উৎপত্তি হয়েছে ?

৩। দেশের সব জমির মালিক কে ছিলেন ?

৪। 'স্কোয়ার' বলতে কি বুঝায় ?

৫। কোন্ দেশে 'ট্রাবাডুর'দের আবির্ভাব হয় ?

৬। কোন্ জিনিসকে কেন্দ্র করে ম্যানর প্রথায় অর্থনৈতিক অবস্থা গড়ে ওঠে ?

৭। ম্যানরের অধিকাংশ জমি কি একসঙ্গে চাষ করা হত ?

৮। ম্যানর প্রথায় চাষী কি শুধু জমিদারকে কর দিত ?

অষ্টম অধ্যায়

ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ

ধর্মযুদ্ধের উদ্দেশ্যসমূহ ঃ সারা পৃথিবীর মুসলমানদের যেমন সবচেয়ে বড় তীর্থ মক্কা তেমন সব দেশের খ্রীস্টানদের সবচেয়ে বড় তীর্থস্থান জেরুজালেম। সপ্তম শতকে আরবগণ পবিত্র জেরুজালেম নগরী অধিকার করে। কিন্তু আরবরা জেরুজালেমের খ্রীস্টানদের ধর্ম-কর্মে কোন বাধা দিত না। অবস্থার পরিবর্তন আসে এগার শতকে যখন তুর্কীস্থান থেকে এসে সেলজুক তুর্কীরা আরবদের এশিয়ার সাম্রাজ্য অধিকার করে। তুর্কীরা আরবদের মত খ্রীস্টানদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করত না। তুর্কীদের আচরণ খ্রীস্টানদের ধর্মবিশ্বাসে আঘাত করে। বিধর্মী তুর্কীদের হাত থেকে প্যালেস্টাইন দেশ ও পবিত্র তীর্থনগরী জেরুজালেম উদ্ধার করার জন্য ইওরোপে জনমত গড়ে ওঠে। শোনা যায় যে পিটার দি হারমিট নামে এক ফরাসী সন্ন্যাসী জেরুজালেমে খ্রীস্টানদের দুর্দশার কথা প্রচার করতে থাকেন। তাঁর প্রচারে অনুপ্রাণিত হয়ে ইওরোপের নানা দেশের মানুষ পবিত্র 'ক্রুশ' উদ্ধারের উদ্দেশ্যে দলে দলে জেরুজালেম যাত্রা করে। এই যুদ্ধ ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ নামে খ্যাত। ধর্মযুদ্ধ মাঝে মাঝে বিরতি নিয়ে দেড়শ বছরের বেশী চলেছিল।

বিধর্মী তুর্কীদের হাত থেকে জেরুজালেম উদ্ধারই কি ধর্মযুদ্ধের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল? না, ধর্মযুদ্ধের পিছনে বহু দেশের বহু উদ্দেশ্য ছিল। ফ্রান্সের নর্মানদের ধর্মযুদ্ধে অংশ গ্রহণের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল আধিপত্য বিস্তার করা। নর্মানরা প্রথমে ফ্রান্সের নর্মাণ্ডিতে বসবাস করতে থাকে পরে ইংলণ্ড জয় করে, তারপর ভূমধ্যসাগরের তীরে আরবদের অধিকারভুক্ত দেশ ও উত্তর-পশ্চিম গ্রীসের এপিরাস আক্রমণ করে। বাইজ্যাণ্টাইন সাম্রাজ্য অধিকার

করার উচ্চাভিলাষই ছিল তাদের ধর্মযুদ্ধে অংশ গ্রহণের প্রধান উদ্দেশ্য।

ভেনিস, জেনোয়া, পিসা প্রভৃতি ইটালীর নগর রাষ্ট্রগুলির ধর্মযুদ্ধে অংশ নেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন, তাদের সকলেরই উদ্দেশ্য ছিল নিজের নিজের জলপথে আধিপত্য বিস্তার। তারা ইওরোপের বিভিন্ন রাজ্যের রাজা ও অভিজাতদের ধর্মীয় উন্মাদনাকে নিজেদের স্বার্থে কাজে লাগাতে চেয়েছিল। ভেনিসীয়রা চতুর্থ ক্রুসেডকে বাইজ্যান্টিয়াম আক্রমণের রূপ দিতে সক্ষম হয়েছিল। তারা বাইজ্যান্টিয়ামের অধিবাসীদের বাইজ্যান্টিয়ামের সম্রাট যে পরিমাণ স্বাধীনতা দিতে ইচ্ছুক তার চেয়ে বেশী স্বাধীনতা দিয়ে বাইজ্যান্টাইন সাম্রাজ্যে লাটিন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার বিষয় চিন্তা করেছিল।

পোপদের আবার অন্য উদ্দেশ্য ছিল, ঐ সময় জার্মানীর সম্রাটদের সঙ্গে পোপদের প্রতিষ্ঠাকরণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছিল। পোপরা ধর্মযুদ্ধের সুযোগে সকল খ্রীস্টানদের সমর্থন পেতে চাই-ছিলেন। পোপ দ্বিতীয় আরবান্ ত ঐ কারণেই ধর্মযুদ্ধে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। পোপদের ধারণা ছিল যে ধর্মযুদ্ধের ফলে তাদের মর্যাদা ও ক্ষমতা দুই-ই বেড়ে যাবে।

ধর্মযুদ্ধে রাজা বা সম্রাটদের নেতৃত্বে অংশ নিয়েছিল প্রধানতঃ নাইট ও অভিজাতরা। রাজা ও সম্রাটদের উদ্দেশ্য ছিল যশ ও সম্মান লাভ, কিন্তু আসল উদ্দেশ্য ছিল শক্তিশালী নাইট ও অভিজাতদের দেশের বাইরে যুদ্ধে ব্যস্ত রেখে দেশে তাদের প্রভাব কমানো আর যুদ্ধে তাদের শক্তি ক্ষয় করা। নাইট ও অভিজাতরা দুর্বল হয়ে গেলে শাসকরা নিজ নিজ দেশে নিজেদের ক্ষমতার প্রসার ঘটাতে পারবেন এই ছিল আসল লক্ষ্য।

ধর্মযুদ্ধের পিছনে যে সব উদ্দেশ্য ছিল সেগুলি তোমাদের বলেছি, এখন তোমাদের প্রথম, তৃতীয় ও চতুর্থ ধর্মযুদ্ধের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বলছি।

পোপ দ্বিতীয় আরবান প্রথম ধর্মযুদ্ধের জন্য ইওরোপের বাসিন্দাদের অনুপ্রাণিত করেন। পিটার দি হারমিট নামক ফরাসী সাধুর বক্তৃতাও অনুপ্রেরণা যোগায়। প্রথম ধর্মযুদ্ধে কোন দেশের রাজা বা রাজকুমার অংশ নেন নি। বুলনের গডফ্রে, লোরেনের ডিউক, নর্মাণ্ডির ডিউক রবার্ট, তুঁলোর কাউণ্ট রেমণ্ড প্রমুখ অভিজাত ব্যক্তি ধর্মযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। ১০৯৭ খ্রীস্টাব্দে ধর্ম-যোদ্ধারা নিসিয়া এবং ১০৯৯ খ্রীস্টাব্দে জেরুজালেম অধিকার করে ঐ জায়গা শাসন করতে থাকে। গডফ্রে নববিজিত স্থানের শাসক ও রক্ষাকর্তা হন। তাঁর মৃত্যুর পর ১১০০ খ্রীস্টাব্দে এডেসার কাউণ্ট বলডুইন জেরুজালেম রাজ্যের প্রথম রাজা হন। তাঁর ও দ্বিতীয় বলডুইনের আমলে তুর্কী ও স্যারাসেনদের আক্রমণ প্রতিহত করা হয়। সিডন, টায়ার, বেরিটাস ও আরও অনেক স্থান মুসলমানদের কাছ থেকে অধিকার করা হয়। কিন্তু জেরুজালেম রাজ্যের নাইট ও ব্যারণদের নিজেদের মধ্যে বিবাদ রাজ্যটিকে দুর্বল করে তোলে। সামন্তদের সৈন্য ছাড়াও, স্থায়ী সেনাদল নিযুক্ত করে ও দুর্গ তৈরী করে রাজ্যটির প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ১১৮৭ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত জেরুজালেম খ্রীস্টানদের অধিকারে থাকে।



সালাদিন

১১৮৭ খ্রীস্টাব্দে জেরু-জালেম রাজ্য মুসলমানরা অধিকার করে নেওয়ায় তৃতীয় ধর্মযুদ্ধ শুরু হয়। তার আগে ১১৪৭ খ্রীস্টাব্দের দ্বিতীয় ধর্ম-যুদ্ধের কোন গুরুত্ব ছিল না। দ্বাদশ শতকেই মুসলমানরা শক্তিসঞ্চয় করে দামাস্কাস ও সিরিয়ার শহরগুলি এক শাসনের অধীনে আনে। মিশরের ওয়াজীর সালাদিন ইউফ্রেটিস থেকে নীল নদ পর্যন্ত ভূখণ্ড ঐক্যবদ্ধ করেন। জেরুজালেম পুনরুদ্ধার

করার জন্য জার্মানীর তথা পবিত্র রোমক সাম্রাজ্যের সম্রাট ফ্রেডারিক বারবোসা (বারবোসা শব্দের অর্থ লালদাড়ি), ফ্রান্সের রাজা ফিলিপ ও ইংলণ্ডের রাজা রিচার্ড একযোগে যাত্রা করেন। কিন্তু মাঝপথেই বারবোসা জলে ডুবে মারা যান, ফিলিপ দেশে ফিরে যান কিন্তু সিংহবিক্রম রিচার্ড একাই তৃতীয় ধর্মযুদ্ধের নেতৃত্ব করেন। রিচার্ড ছিলেন সেনাপতি হিসেবে সালাদিনের চেয়ে বেশী দক্ষ। রিচার্ড ধর্মযুদ্ধের সকল নেতাদের মধ্যে ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। সালাদিনও অনেক খ্রীস্টান শাসকের চেয়ে বেশী শিক্ষিত ও ভদ্র ছিলেন। রিচার্ড ও সালাদিন একে অপরকে সম্মান করতেন। একবার রিচার্ড অসুস্থ হয়ে পড়ায় সালাদিন রিচার্ডের তাঁবুতে সেরা ফল ও নিজের চিকিৎসককে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। একবার রিচার্ডের যুদ্ধের ঘোড়াটি মারা গেলে রিচার্ড মাটিতে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করছিলেন, তাঁকে ঐ অবস্থায় দেখে সালাদিন রিচার্ডকে একটি সুন্দর আরবি ঘোড়া উপহার দিয়ে বলেন যে রিচার্ডের মত বীরের পক্ষে ঘোড়া না চড়ে যুদ্ধ করা মানায় না। রিচার্ড ও সালাদিনের মধ্যে তিন বছরের জন্য সন্ধি হয়েছিল।



'সিংহবিক্রম' রিচার্ড

১২০১ খ্রীস্টাব্দের **চতুর্থ ধর্মযুদ্ধের** জন্য অনুপ্রেরণা যোগান কয়েকজন সন্ন্যাসী আর নেতৃত্ব দেন পোপ তৃতীয় ইনোসেন্ট্। কিন্তু ঐ ধর্মযুদ্ধকে ধর্মযুদ্ধ বলা কতখানি সঙ্গত? কারণ সে সকল নাইট ও অভিজাতরা ঐ ধর্মযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন পবিত্র ভূমি উদ্ধারের চেয়ে নিজের ভাগ্য পরিবর্তন ও আখের গোছানোর দিকে ছিল তাঁদের বেশী আগ্রহ।

চতুর্থ ধর্মযুদ্ধের নেতারা স্থলপথের দুঃখ-কষ্টকে বর্জন করেন। ভেনিসের বাসিন্দাদের কাছ থেকে পঁচাশী হাজার মার্ক দামে খাবার কেনেন আর পবিত্র ভূমিতে যাবার ব্যবস্থা করেন। ভেনিসের লোকজন জারা পুনরুদ্ধারের জন্য ব্যস্ত ছিল। জারা উদ্ধার করে দিলে ভেনিসকে পঁচাশী মার্কের অধিক দিতে হবে না বলে ঠিক হয়। ধর্মযুদ্ধে জয়লাভের পর জয় করা ভূখণ্ডের অর্ধেক ভেনিসকে দিতে হবে—এই শর্তে ভেনিস পঞ্চাশটি সশস্ত্র গ্যালি নিয়ে ধর্মযুদ্ধে যোগ দেয়। জারা ছিল খ্রীস্টান রাজার অধীন—বিদ্রোহ করে ভেনিস থেকে স্বাধীন হয়ে গিয়েছিল। ধর্মযোদ্ধাদের ঐ আচরণে পোপ অত্যন্ত রেগে যান।

১২০৩ ও ১২০৪ খ্রীস্টাব্দে ভেনিসীয়রা ও ধর্মযোদ্ধারা বাইজ্যান্টাইন সাম্রাজ্য ধ্বংস করে। ঐ দুবারই কনস্ট্যান্টিনোপল অধিকার করে। বাইজ্যান্টাইন সাম্রাজ্যের অধিকাংশ ভেনিস অধিকার করে আর বাকী অংশে লাটিন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ১২৬১ খ্রীস্টাব্দে বাইজ্যান্টাইন সাম্রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়, ১৪৫৩ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত তার অস্তিত্ব বজায় থাকে।

সমাজ ও সংস্কৃতিতে ধর্মযুদ্ধের প্রভাবঃ পবিত্র ভূমি উদ্ধার সম্ভব না হলেও ইওরোপের সমাজ জীবনে ধর্মযুদ্ধের প্রভাব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বহু ভূমিদাস ধর্মযুদ্ধে অংশ নিয়ে ভূমিদাসের ঘৃণ্য-জীবন থেকে মুক্তি পায়।

ধর্মযুদ্ধের ফলে শহরের প্রসার হয়—শহরে শিল্প গড়ে ওঠে। বহু ভূমিদাস ম্যানর থেকে পালিয়ে গিয়ে শহরে লুকিয়ে থাকে পরে শিল্পে নিযুক্ত হয়, ফলে স্বাধীন হয়ে যায়। ধর্মযুদ্ধে অংশ নেওয়ার জন্য পুরুষরা দীর্ঘকাল বাড়িতে না থাকায় নারীরা জায়গা-জমি সংক্রান্ত দায়িত্ব চালায়—ফলে নারীদের মর্যাদা সমাজে বেড়ে যায়।

ধর্মযুদ্ধের ফলে গ্রীক ও স্যারাসেনদের সঙ্গে নতুন করে সংযোগ ঘটায় ইওরোপের লোকেদের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রায় বহু

পরিবর্তন আসে। প্রাচ্যের লোকদের মত ইওরোপের লোকেরা জামা-কাপড় পরতে ও খাবার খেতে থাকে। যাজকরা লম্বা দাড়ি রাখতে শুরু করেন। নানারকম প্রসাধনের জিনিস, চন্দন, রূপোর বাসন প্রভৃতির ব্যবহার শুরু হয়। ধর্মযুদ্ধের ফলে একদল যোদ্ধা-সন্ন্যাসীর সৃষ্টি হয় যাদের চেষ্টায় ইওরোপে পৌত্তলিক জাতিদের মধ্যে খ্রীস্টধর্ম প্রচারিত হয়। ইওরোপে যুদ্ধরীতির পরিবর্তন হয়। প্রাচ্যের অনুকরণে বড় বড় দুর্গ তৈরী করা হয়।

শহর ও বাণিজ্য কেন্দ্রের উদ্ভব ঃ ধর্মযুদ্ধে ব্যস্ত সামন্তদের টাকা ধার দিয়ে শহরের মহাজনরা বিশেষ সুবিধে-সুযোগ পেয়ে যায়। ধন-সম্পদ ক্রমে অভিজাতদের হাত থেকে শহরের ব্যবসায়ী ও বণিকদের হাতে চলে যায়। ধর্মযুদ্ধের ফলে মালের চাহিদা বেড়ে যায়, প্রাচ্যের সঙ্গে যোগাযোগও বেড়ে যায় আর তার ফলে ইটালীর ভেনিস, জেনোয়া ও পিসার সম্পদ ও খ্যাতি বেড়ে যায়।

কৃষি ও কুটীর শিল্পের পৃথকীকরণ ঃ শহরগুলি ছিল কুটীরশিল্পের প্রাণকেন্দ্র। মুক্তির জন্য শহরগুলি ম্যানরের ভূমিদাসদের হাতছানি দিত। বহু ভূমিদাস পালিয়ে এসে শহরে শিল্পে নিযুক্ত হত। ক্রমে দেখা গেল জমির মালিক হলেই সমাজে মর্যাদা ও সম্মান পাওয়া যায় না। ব্যবসা-বাণিজ্য করে পয়সা সঞ্চয় করলেও সমাজে গুরুত্ব পাওয়া যায়। ঐ সময় থেকে কৃষি থেকে কুটীর-শিল্প আলাদা হয়ে পড়ে। কৃষির স্থান গ্রামে আর কুটীরশিল্পের স্থান গ্রামের পরিবর্তে নতুন নতুন গজিয়ে ওঠা শহরগুলিতে।

অনুশীলনী

(ক) ১। ধর্মযুদ্ধের উদ্দেশ্যগুলি সম্পর্কে আলোচনা কর।

২। প্রথম ধর্মযুদ্ধের ইতিহাস লেখ।

৩। তৃতীয় ধর্মযুদ্ধের বিষয় যা জান লেখ।

৪। চতুর্থ ধর্মযুদ্ধের ইতিহাস লেখ।

৫। ইওরোপের সমাজ ও সংস্কৃতিতে ধর্মযুদ্ধের কি প্রভাব পড়ে ?

(খ) **সংক্ষেপে উত্তর দাও :**

১। 'সিংহবিক্রম' রিচার্ড সম্বন্ধে আলোচনা কর।

২। সালাদিন ও রিচার্ডের মধ্যে যে সম্পর্ক ছিল তা বর্ণনা কর।

৩। ধর্মযুদ্ধের ফলে কিভাবে শহর ও বাণিজ্য-কেন্দ্রগুলি গড়ে ওঠে ?

৪। ধর্মযুদ্ধের পর ইওরোপের কৃষি ও কুটীরশিল্পের আলাদা হওয়ার বিষয় লেখ।

(গ) **মৌখিক প্রশ্নাবলী :**

১। কেন ধর্মযুদ্ধ শুরু হয় ?

২। প্রথম ধর্মযুদ্ধের সময় পোপ কে ছিলেন ?

৩। তৃতীয় ধর্মযুদ্ধের জন্য কোন্ কোন্ রাজা একসঙ্গে জেরুজালেম যাত্রা করেন ?

৪। কত খ্রীস্টাব্দে মুসলমানরা জেরুজালেম পুনরায় অধিকার করে ?

৫। ধর্মযুদ্ধের দ্বারা কি জেরুজালেম উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছিল ?

নবম অধ্যায়

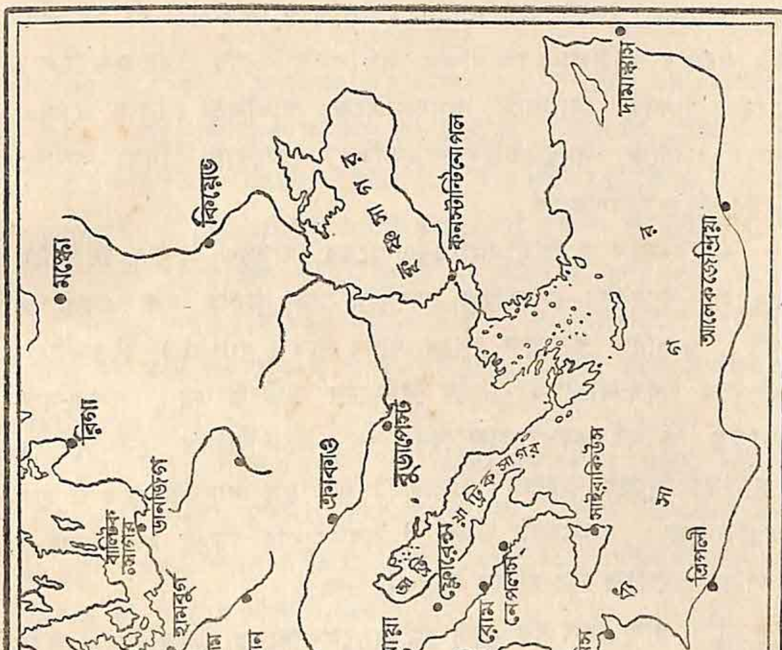
শহরের প্রসার

পৃথিবীর নানা প্রান্তে সব যুগের সভ্যতায় নগরগুলি ছিল সংস্কৃতি ও সভ্যতার প্রধান কেন্দ্র। শহরে আত্মপ্রকাশ করে বড় বড় বাড়ি, বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়। শহরগুলো থেকে গড়ে বাণিজ্য।

পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের পতনের পরের পাঁচশ বা ছয়শ বৎসরের পরেও পশ্চিম ইওরোপে কোন বড় শহরের অস্তিত্ব ছিল না, পঞ্চম শতকে জার্মান জাতির আক্রমণের ফলে বহু নগর ধ্বংস হয়ে যায়। ধ্বংসের হাত থেকে যে কটি শহর টিঁকে থাকে তাদের আর আগের মত গুরুত্ব থাকে না। দশম শতক থেকে নগরগুলির পুনরুত্থান দেখতে পাই।

মধ্য যুগের কোন কোন শহর গড়ে উঠেছিল কোন সামন্তের কেল্লাকে বা কোন গীর্জাকে কেন্দ্র করে। কতকগুলি শহরের আবার সৃষ্টি হয় ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসেবে। শহরগুলি কয়েকটি রাস্তার সংযোগ হচ্ছে এমন জায়গায় বা নদীর তীরে আত্মপ্রকাশ করে। পুরানো রোমান আমলের ধ্বংসাবশেষের ওপরও কয়েকটি শহর নতুন করে গড়ে ওঠে। ইটালীর শহরগুলি বা লণ্ডন, ব্রিস্টল, রিমস, নরউইচ বাদে মধ্যযুগের বেশীর ভাগ শহর ছিল আয়তনে ছোট। ঐ সব ছোট শহরের সঙ্গে বাইরের জগতের তেমন যোগাযোগ ছিল না। শহরের বাসিন্দাদের প্রয়োজনমত পণ্য তৈরী করা হত। শহরগুলি যে জমিদারের এলাকায় পড়ত সেইসব জমিদারদের শহরে থাকত প্রবল প্রতাপ।

ধর্মযুদ্ধের অবদান :—মধ্যযুগে ইওরোপের শহরগুলির উন্নতির ক্ষেত্রে ধর্মযুদ্ধগুলির যথেষ্ট অবদান ছিল। শহরগুলিতে ব্যবসা-বাণিজ্য যত বাড়ে, শহরের লোকদের সম্পদও বাড়তে থাকে। শহরের জনগণ পয়সার বিনিময়ে তাদের স্বাধীনতা কেনার সুযোগ


মধ্যযুগের শহর
মস্কো
কিয়েভ
কৃষ্ণ সাগর
কনস্টান্টিনোপল
দামাস্কাস
আলেকজেন্দ্রিয়া
রিগা
ডানজিগ
বাল্টিক সাগর
হামবুর্গ
ক্রাকাও
বুডাপেস্ট
রোম
নেপলস
সাইরাকিউস
ত্রিপলী
টিউনিস
জেনোয়া
বার্সিলোনা
মাদ্রিদ
টলেডো
কার্ডোভা
কাডিজ
প্যারিস
ক্যালে
ঘেন্ট
আমস্টার্ডাম
কলোন
লণ্ডন
ডাবলিন
এডিনবরা
উত্তর সাগর
ব্রেস্ট
আটলান্টিক মহাসাগর

পায়। ধর্মযুদ্ধের সময় রাজা বা সামন্ত সকলের টাকার দরকার। কারণ তাদের হয় নিজেদের চেষ্টায় লড়াই করতে হবে—অথবা দুর্গ বা কেল্লা তৈরী করতে হবে। ধর্মযুদ্ধে যাওয়ার খরচের জন্য কি রাজা বা অভিজাত কি যাজক সকলেরই টাকার প্রয়োজন ছিল। তাঁরা টাকার বিনিময়ে নগরগুলিকে স্বাধীনতা দিয়ে দেন। ব্যবসা-বাণিজ্যে সমৃদ্ধ ইটালীর ভেনিস, জেনোয়া, পিসা কার্যতঃ নগর রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

বণিক-সংঘ ও শিল্পী-সংঘঃ—শহরের জনগণ টাকার বিনিময়ে যে সব অধিকার পেয়েছিল সেগুলি রক্ষা করার জন্য একতাবদ্ধ হয়। একাদশ শতকের শেষে বণিক-সংঘ (guild) গড়ে ওঠে। ঐ সংঘ শহর-জীবনের একটি বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়। বণিক-সংঘ খাবার জিনিস ছাড়া বাজারের সব কিছু জিনিস কেনা-বেচার ব্যাপারে নিয়ন্ত্রণ করত। খাবার জিনিস ছিল সব রকম কর ও শুল্ক থেকে মুক্ত। গিল্ডগুলি একসঙ্গে সব পণ্যের বিক্রী বন্ধ করত—কারণ ঐ ক্ষেত্রে চড়া দামের সম্ভাবনা ছিল।

গিল্ডগুলি ছিল সব রকম অবৈধ লেনদেনের বিরোধী। কোন জিনিসের দাম বাড়তে পারে—এই আশায় কোন জিনিসকে আটকে রাখার ব্যাপারে গিল্ডগুলির অমত ছিল। এইভাবে তারা সমাজের প্রতি কর্তব্য পালন করত। সংঘগুলির গুরুত্বপূর্ণ সভার শেষে পান-ভোজনের ব্যবস্থা থাকত। কোন সদস্য অসুস্থ হয়ে পড়লে বা আগুন লেগে বা অন্য কোন কারণে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হলে সংঘ থেকে সেই লোককে সাহায্য দেওয়া হত। কালক্রমে গিল্ডগুলির প্রভাব এমনভাবে বেড়ে যায় যে গিল্ডের কর্মকর্তারাই হয়ে দাঁড়ায় শহরের কর্মকর্তা আর গিল্ড-হল হয়ে যায় টাউন হল—যেখান থেকে শহরের পৌরসভার কাজকর্ম চালনা করা হত।

বণিক-সংঘের মত শিল্পীদের স্বার্থরক্ষার জন্য শিল্পী-সংঘও ছিল। অবশ্য শিল্পী বা কারিগররাও বণিক-সংঘের সদস্য হতে পারত।

প্রত্যেক শহরে তাঁতী, ছুতোর, মুচি, কামার আলাদা আলাদা গিল্ড প্রতিষ্ঠা করে। ক্রমে সেখানে ওস্তাদ কারিগররা সহকারীদের ওপর শোষণ চালাতে থাকে। বণিক-সংঘের মত শিল্পী ও কারিগরদের সংঘও কতকগুলি সামাজিক ও জনকল্যাণমূলক কাজ-কর্ম করত। বয়স্ক ও রুগ্ন সদস্যকে অর্থসাহায্য দিত। বিধবাদের পেনসন ও গরীব সদস্য মারা গেলে তার শেষকৃত্যের জন্য অর্থসাহায্য করত। যদি কোন শিল্পী বা কারিগর একটা কাজ শেষ করার আগেই অসুস্থ হয়ে পড়ত তবে অন্য কোন শিল্পী বা কারিগর সেই কাজটিকে সম্পূর্ণ করে দিত। কতকগুলি সংঘ বিদ্যালয় চালনা করত। কোন কোন সংঘ নাটকের অভিনয় করাত—তার ফলে মধ্য যুগে নাটকের প্রসার শুরু হয়।

দ্বাদশ শতকে ব্যবসা-বাণিজ্য উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যায়। ফলে শহরগুলির সম্পদও বাড়তে থাকে। মুসলমান আক্রমণ, ধর্মযুদ্ধের যেমন ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের ক্ষেত্রে অবদান ছিল—গিল্ডগুলির সেরকম অবদান ছিল।

শহরের জীবনযাত্রাঃ—শহরের জীবনযাত্রার সঙ্গে গ্রামের জীবনযাত্রার কোন মিল ছিল না। শহরের লোক চাষের বদলে করত ব্যবসা বা কারিগরি। শহরের বাজারে দূর দূর দেশ থেকে পণ্য আসত। গ্রামের লোকেরা নুন, তেল, মসলা, লোহা কিনতে আর বাড়তি চাষের জিনিস শহরে বিক্রী করতে আসত।

শহরে নগদ পয়সা থাকায় চোর-ডাকাতের উপদ্রব ছিল। নিরাপত্তার জন্য শহরগুলি কোন সামন্তের দুর্গের আশেপাশে গড়ে উঠত। সামন্ত প্রভুকে শহরবাসীদের খাজনা দিতে হত। পরে শহরকে ঘিরে উঁচু পাঁচিল তৈরী হতে থাকে। ঘেরা শহরে ঢোকার জন্য ফটক থাকত। বিপদে ফটক বন্ধ করে দেওয়া হত। শহরের ভেতরেও দাঙ্গা-হাঙ্গামা বা চোর-ডাকাতের উপদ্রব লেগে থাকত। অবশ্য শান্তিরক্ষার জন্য রক্ষীবাহিনীও ছিল।

মধ্য যুগের শহরগুলি ছিল ছোট কিন্তু লোকের ভিড় ছিল যথেষ্ট। রাস্তাগুলি ছিল সরু, আঁকাবাঁকা, কোথাও পাথর-বাঁধানো আবার কোথাও বা কাঁচা। সরু রাস্তার দুদিকে কাঠের তৈরী উঁচু উঁচু বাড়ি। শহরের রাস্তাগুলি ছিল সরু, অন্ধকার, দুর্গন্ধযুক্ত আর হৈ-হট্টগোলে ভরা। ঐ রাস্তা দিয়ে গাড়িওয়ালা, ঘোড়সওয়ার ও সাধারণ মানুষ পায়ে হেঁটে চলাফেরা করত। মাঝে মাঝে মড়কে বা আগুন লেগে শহর উজাড় হয়ে যেত।

শহরগুলিতে সরাইখানা ছিল। ভবঘুরে লোকেরা সেখানে আশ্রয় নিত।



মধ্য যুগের শহরের বাজার

দিনভর শহরের বাজারে আড্ডা, গল্প-গুজব ও হৈ-চৈ চলত। রাতে পানশালায় হল্লা ও আড্ডা চলত। মাঝে মাঝে শহরে মেলা বসত। নানা দেশ থেকে রকমারি জিনিস এনে বিক্রী করা হত।

রাজকীয় সনদের বলে শহরের স্বায়ত্তশাসনাধিকারঃ শহরের বিভিন্ন গিল্ডগুলি শহরবাসীদের করে সংঘবদ্ধ। ব্যবসা-বাণিজ্যের ফলে তারা হয় বিত্তশালী আর বিত্তের দৌলতে থাকে সেনাবল। ঐ অবস্থায় শহরবাসীরা আর সামন্তপ্রভুর অধীন থাকতে চায় না। কোথাও টাকা দিয়ে আবার কোথাও বা জোর করে তারা পৌর-শাসনাধিকার আদায় করে নেয়। রাজকীয় সনদের বলে শহরগুলি

স্বাধীনভাবে আইন, মুদ্রা, ফৌজ-পরিচালনা বিষয়ে ক্ষমতা পায়। ইটালীর ফ্লোরেন্স, জেনোয়া, মিলান ও জার্মানীর ল্যুবেক, হামবুর্গ প্রভৃতি শহর প্রায় স্বাধীন রাষ্ট্র হয়ে ওঠে। ঐ সব শহরে এক একটি বর্ধিষ্ণু পরিবার রাজ-ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ওঠে।

বুর্জোয়া শব্দের উৎপত্তিঃ মধ্য যুগের শহরগুলির অন্যতম প্রধান অবদান 'বুর্জোয়া' সম্প্রদায়ের সৃষ্টি। শহরবাসী বিত্তশালীদের মধ্য থেকে লেখাপড়া জানা বুদ্ধিদীপ্ত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় বা বুর্জোয়া শ্রেণী সৃষ্টি হয়। ইওরোপে জাতীয় রাষ্ট্র গঠনে তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। সামন্তদের দমনের ক্ষেত্রে রাজারা বুর্জোয়াদের সহযোগিতা পান। তাদের টাকায় রাজা স্থায়ী সেনা নিয়োগ করেন —সামন্তদের সামরিক সাহায্যের উপর আর নির্ভর করতে হয় না— ফলে রাজার পক্ষে সামন্তদের দমন করা সম্ভব হয়। বুর্জোয়া সম্প্রদায়ের সৃষ্টি না হলে মধ্য যুগে এমনকি আধুনিক যুগে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পরিবর্তন আসত না।

অনুশীলনী

(ক) ১। মধ্যযুগের শহরগুলি কোথায় কোথায় গড়ে উঠেছিল ?

২। মধ্যযুগের গিল্ডগুলির কার্যকলাপের বিবরণ দাও।

৩। মধ্যযুগের শহরের জীবন-যাত্রার বর্ণনা দাও।

(খ) **সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী ঃ—**

১। মধ্যযুগের শহরগুলির প্রসারের বিষয়ে ধর্মযুদ্ধের কি অবদান ছিল ?

২। রাজকীয় সনদের বলে শহরগুলি কিভাবে স্বায়ত্বশাসনাধিকার পায় ?

৩। 'বুর্জোয়া' শব্দের উৎপত্তি সম্পর্কে আলোচনা কর।

(গ) **মৌখিক প্রশ্নাবলী ঃ—**

১। কোন্ সময়ে গিল্ডগুলি গড়ে ওঠে ?

২। মধ্যযুগের শহরগুলি কি আয়তনে বেশ বড় ছিল ?

৩। শহরবাসীরা কার মধ্য দিয়ে সংঘবদ্ধ হয় ?

৪। 'বুর্জোয়া' বলতে কোন্ শ্রেণীর লোককে বোঝায় ?

৫। 'বুর্জোয়া' সম্প্রদায়ের সৃষ্টি না হলে কি হত ?

দশম অধ্যায়

মধ্য যুগে দূরপ্রাচ্য

মধ্য যুগে চীন

দূর প্রাচ্য :—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে দূরপ্রাচ্য বলতে পূর্ব এশিয়ার সব কয়টি দেশকে বোঝাত না ; দূরপ্রাচ্য বলতে প্রধানতঃ চীন, জাপান, কোরিয়া ও বৈকাল হ্রদের পূর্ব দিকের রাশিয়ার কিছু অংশকে বোঝাত।

এখন তোমাদের দূরপ্রাচ্যের প্রধান দুটি দেশ চীন ও জাপানের মধ্যযুগের ইতিহাসের বিষয় সম্বন্ধে জানাব। প্রথমে চীনের বিষয়ে আলোচনা করা যাক।

চীনে তাং বংশের শাসনকাল

চীনে তাং বংশের শাসনের সূত্রপাত ৬১৮ খ্রীস্টাব্দে, শেষ ৯০৭ খ্রীস্টাব্দে। তাং বংশের রাজারা প্রায় তিনশ বছর চীনে রাজত্ব করেন। ঐক্য, শান্তি, সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রসারের জন্য তাং শাসনকাল চীনের 'স্বর্ণযুগ' নামে খ্যাত।

চীনে ঐক্য প্রতিষ্ঠা : দেশে ঐক্য প্রতিষ্ঠা তাং বংশের রাজাদের অন্যতম প্রধান কীর্তি। হান বংশের শাসনের শেষ দিকে চীন দুর্বল হয়ে পড়ে। বিদেশী শত্রু তাতারদের আক্রমণে চীন সাম্রাজ্য ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, দেশে দেখা দেয় অরাজকতা। তাং বংশের দ্বিতীয় রাজা ছিলেন তাই সুং। তিনি বিদেশী তাতারদের চীন থেকে বিতাড়িত করে চীনকে পুনরায় ঐক্যবদ্ধ করেন। চীনের ঐক্য স্থাপনই ছিল সম্রাট তাই সুং-এর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান। তিনি ছিলেন ভারতের হর্ষবর্ধনের সমসাময়িক। তাই সুংকে তাঁর কীর্তির জন্য 'সিং হুয়াং' বা গৌরবময় সম্রাট বলা হয়ে থাকে।

তাই সুং কেবল তাতারদের বিতাড়িত করেননি, তিনি তুর্কীস্থান, তিব্বত, আনাম ও কিরগিজ প্রান্তর পর্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তার করেন।

তাঁর পুত্র কোরিয়া জয় করে করদ রাজ্যে পরিণত করেন। ঐ সময়ে পৃথিবীর অন্য কোনও দেশে তাং সাম্রাজ্যের মত বড় আর শক্তিশালী সাম্রাজ্য ছিল না।

আইন সংকলনঃ তাং আমলে চীনের আইন-কানুন সংকলন করে লিখে রাখার ব্যবস্থা করা হয়। শাসন বিভাগের উন্নতি বিধান করা আর অপরাধীদের প্রতি দণ্ডের কঠোরতা হ্রাস করা ছিল আইনের লক্ষ্য। সম্রাট তাই সুং বলতেন অপরাধীদের শাস্তি দিয়ে অপরাধের মাত্রা কমান যায় না। তাঁর উদারতার সম্বন্ধে একটি সুন্দর কাহিনী প্রচলিত আছে। তিনি একদিন রাজধানীর একটি কারাগার দেখতে যান। সেখানে ২৯০ জন লোক মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত ছিল। তিনি তাদের মুক্তির আদেশ দিয়ে চাষ করতে পাঠান। তারা কথা দেয় যে তারা ফিরে আসবে। কথামত সকলে ফিরে এলে তিনি সকলকে মুক্তি দেন। তাই সুং নিয়ম করেন যে, ভবিষ্যতে প্রাণদণ্ড দেওয়ার আগে সম্রাটকে তিন দিন অনশন করতে হবে। পরবর্তীকালে দেশে মৃত্যুদণ্ড ছিল না বললেই চলে।

শিক্ষাঃ তাং আমলে চীনে শিক্ষা ও সংস্কৃতির যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। দেশে অনেকগুলি শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। সবচেয়ে বিখ্যাত ছিল হান্‌লিনের বিদ্যালয়। আমলাদের উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়ার জন্য বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করা হয়।

ঐ বিদ্যালয়ে পুরাতন তথ্য বিশ্লেষণ করে চীনের ইতিহাস লেখা হত। প্রাচীন পুঁথি শুদ্ধ ভাবে নকল ও সম্পাদনা করে প্রকাশ করা হত। তাং আমলে দুটি বিশ্বকোষ রচনা করা হয়। কনফুসিয়াসের রচনার নতুন সংস্করণ করা হয়।

দেশে বহু গ্রন্থাগার ছিল। সরকারী গ্রন্থাগারে কয়েক হাজার অমূল্য পুঁথি ও বই সংরক্ষিত ছিল। তাং আমলে গ্রন্থাগারগুলিতে বই-এর সংখ্যা বাড়তে থাকে। বিখ্যাত পর্যটক হিউয়েন সাঙ্ তাং আমলে ভারতে আসেন। ভারত থেকে সংস্কৃত ভাষায় লেখা বহু ধর্মবিষয়ক বই তিনি চীনদেশে নিয়ে যান। ঐ

বইগুলি চীনা ভাষায় অনুদিত হবার পর গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত হয়।

সাহিত্যঃ তাং আমলে সাহিত্যেরও যথেষ্ট উন্নতি হয়। ঐ সময় চীনে বহু যশস্বী কবি ও সাহিত্যিকের আবির্ভাব হয়। কবি ও সাহিত্যিকদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ছিলেন কবি লি পো। তাঁর সমসাময়িক চীনাগণ মনে করতেন যে তাঁর কবিতায় যেন স্বর্গের সুধা ঝরে পড়ত—সেই কারণে চীনারা তাঁকে "স্বর্গচ্যুত দেবদূত" আখ্যা দিয়েছেন।

চা-এর ব্যবহারঃ বর্তমানে সারা পৃথিবীতে 'চা' অত্যন্ত জনপ্রিয় পানীয়। তোমরা শুনলে অবাক হবে যে চীন দেশেই সর্বপ্রথম পানীয় রূপে চায়ের ব্যবহার শুরু হয় তাং যুগে। ঐ সময় থেকে চীনের জনসাধারণও চা পান শুরু করে। তাং আমলে চা-এর ব্যাপকহারে চাষ করা শুরু হয়।

ছাপাখানা আবিষ্কারঃ তাং আমলে চীনে জ্ঞান-বিজ্ঞানের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। চীনারা কাগজ ও ছাপাখানা আবিষ্কার করেছিল ঐ যুগে। ইওরোপের লোকেরা অনেক পরে ঐ সকল বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে।

চীনারা কাঠের অক্ষরের সাহায্যে ছাপার কাজ শুরু করে। মানব সভ্যতার ইতিহাসে কাগজ ও ছাপাখানার ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

শিল্পঃ তাং যুগে শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি হয়। মূর্তিশিল্প ও চিত্রকলা উভয় বিষয়েই চীনা শিল্পীরা বিশেষ নৈপুণ্য দেখান। ঐ যুগের বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের মূর্তিগুলি ছিল প্রাণবন্ত। মূর্তিগুলিতে মানুষের দয়ামায়া যেন ফুটে উঠেছে।

চীনের সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্রকর ছিলেন উতাও-ৎসে, তাং যুগে তাঁর আবির্ভাব হয়। তাঁর চিত্ররীতি ভবিষ্যতের চীনা ও জাপানী চিত্ররীতিকে প্রভাবিত করে। এ যুগের অধিকাংশ চিত্রের বিষয়-বস্তু ধর্মভিত্তিক। অবশ্য প্রাকৃতিক দৃশ্যকে বিষয়বস্তু করেও ছবি আঁকা হত।

তাং যুগে মৃৎপাত্র গড়নে বিশেষ উন্নতি হয়। ঐ যুগের মৃৎশিল্পীরা পালিশের কাজে ও পালিশের রং ও নকশার কাজে বিশেষ



তাং যুগের শিল্পবস্তু

দক্ষ ছিলেন। হাতির দাঁতের ও মণিমাণিক্যের সূক্ষ্ম কাজেও ঐ যুগের শিল্পীরা বিশেষ কৃতিত্ব দেখান।

ব্যবসা-বাণিজ্য ও কৃষির উন্নতি ঃ তাং যুগে চীনের ব্যবসা-বাণিজ্য ও কৃষির উন্নতি উল্লেখযোগ্য। চীনের বাণিজ্য-তরীগুলি ভারত মহাসাগর ও পারস্য উপসাগরের তীরে অবস্থিত বন্দরে যাতায়াত করত। চীনারা ভারতীয় ও আরবদের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করত। চাল, রেশম, মসলা চীন থেকে রপ্তানী করা হত।

তাং যুগের সূচনায় চীনের প্রধান দুটি বাজার ছিল দু জায়গায়—একটি চাঙ্-আনে এবং অন্যটি লো-য়াঙ্এ। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের সাথে চীনের বিভিন্ন প্রদেশে প্রধান খাদ্য-শস্য ও বিলাস-দ্রব্যের বাজার গড়ে ওঠে। ব্যবসা-বাণিজ্য এমনভাবে বেড়ে ওঠে যে রূপার টাকার প্রচলন হয়। আগে রেশমী কাপড়ের বিনিময়ে পণ্য কেনা-বেচা চলত।

তাং যুগের কৃষির যথেষ্ট উন্নতি হয়। অষ্টম ও নবম শতকে চীনের সমৃদ্ধি বেড়ে ওঠে। দেশ ধন-ধান্যে ভরে যায়। লোকসংখ্যা

বেড়ে যাওয়ায় লোকেরা চীনের উর্বর দক্ষিণাংশে বসবাস করতে থাকে, শস্যের উৎপাদন বেড়ে যায়। আখ ও চায়ের ব্যাপকহারে চাষ-আবাদ শুরু হয়। ইয়াংসি নদীর উপত্যকার জমিতে দুইবার চাষ দেওয়ার ফলে কৃষির উৎপাদন যথেষ্ট বেড়ে যায়। একই জমিতে ধান পরে শীতকালে গম বা অন্যান্য শস্য উৎপাদন করা শুরু হয়।

বৌদ্ধধর্মের প্রসারঃ তাং যুগে বৌদ্ধধর্মের প্রসার লক্ষ্য করার মত। সম্রাট তাই-সুং-এর আমলে বৌদ্ধধর্মের জন্মভূমি ভারতবর্ষে আসেন প্রসিদ্ধ চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন-সাঙ্। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ করা ও বৌদ্ধধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধে অবগত হওয়া। হিউয়েন-সাঙ্ ভারত থেকে সংস্কৃতে লেখা বহু ধর্মপুস্তক চীনদেশে নিয়ে যান—ঐগুলি চীনা ভাষায় অনুবাদ করা হয়। হিউয়েন-সাঙ্ যেমন চীন থেকে ভারতে এসেছিলেন, তেমন ভারত থেকে অনেক বৌদ্ধ ভিক্ষু চীনদেশে গিয়ে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন।

চীনা সভ্যতার প্রসারঃ তাং যুগে দেশে রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে দেশে উন্নতির পথ সুগম হয়ে ওঠে। দেশে শান্তি ও সমৃদ্ধির ফলে বিদেশেও চীনের সভ্যতার প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে। তাং রাজাদের সাম্রাজ্য ছিল আয়তনে বিশাল, বহু দেশ নিয়ে গঠিত ছিল তাং সাম্রাজ্য। ঐ সকল দেশে চীনা সভ্যতা সহজেই প্রসার লাভ করে। জাপান, কোরিয়া, আনাম, কম্বোডিয়া সব দেশেই চীনের সভ্যতা ও সংস্কৃতির সুস্পষ্ট প্রভাব ছিল। কোরিয়া ছিল চীনের করদ রাজ্য—কোরিয়া থেকে জাপানে চীনের সভ্যতা, সংস্কৃতি, বৌদ্ধধর্ম প্রসার লাভ করে। চীন ও জাপানের ভাষা আলাদা—কিন্তু চীনের লিপির সঙ্গে জাপানের লিপির মিল আছে। জাপানের লিপি, সাহিত্য, বৌদ্ধধর্ম—সকল ক্ষেত্রে চীনের প্রভাব সুস্পষ্ট।

আদর্শরূপে চীন দেশঃ তাং যুগে চীন বিভিন্ন দেশের কাছে আদর্শ হয়ে ওঠে। প্রতিবেশী দেশগুলিতে বৌদ্ধধর্ম, সাহিত্য, কৃষ্টি, সংস্কৃতি সকল বিষয়ে চীনের প্রভাব পড়ে।

ইওরোপীয়দের বহু পূর্বেই চীনারা বারুদ আবিষ্কার করে। চীনাদের কাছ থেকেই সম্ভবতঃ আরবরা কাগজ তৈরী করতে শেখে, পরে সেই জ্ঞান ইওরোপে প্রচার করে। ইওরোপীয়দের অনেক আগেই চীনারা কাঠের অক্ষরের সাহায্যে ছাপাখানা আবিষ্কার করে এবং জ্ঞানবিস্তারের ক্ষেত্রে এক বিপ্লব ঘটায়।

চীনের রাজাদের ধর্মসহিষ্ণুতা লক্ষণীয়। তাং যুগে চীনদেশে জরথুস্ট্রপন্থীরা, খ্রীস্টান ও মুসলমানগণ যথোচিত সমাদর পায়। তাং রাজাদের রাজধানী সিয়ান্-ফুতে একটি গীর্জা আর ক্যান্টনে একটি মসজিদ নির্মাণ করা হয়।

হিউয়েন-সাঙের ভারত ভ্রমণ

হিউয়েন-সাঙ্ ছিলেন প্রসিদ্ধ চীনা পরিব্রাজক। তিনি ছিলেন বৌদ্ধ। বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভের জন্য তিনি বহু দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে ভারতে এসেছিলেন। তিনি ছিলেন প্রসিদ্ধ তাং সম্রাট তাই স্থং-এর সমসাময়িক। ঐ সময় চীনাদের বিদেশ যাত্রা নিষিদ্ধ ছিল। ৬২৯ খ্রীস্টাব্দে ২৮ বা ২৯ বছরের যুবক হিউয়েন-সাঙ্ কয়েকজন সঙ্গীসহ এক রাত্রিতে গোপনে চীনের রাজধানী সিয়ান্-ফু বা চাংফন ত্যাগ করেন। প্রহরীদের সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে অনেক পাহাড়-পর্বত পার হয়ে গোবি মরুভূমি পার হবার সময় পথ হারান। নিহত মানুষ ও পশুদের কঙ্কাল অনুসরণ করে তিনি

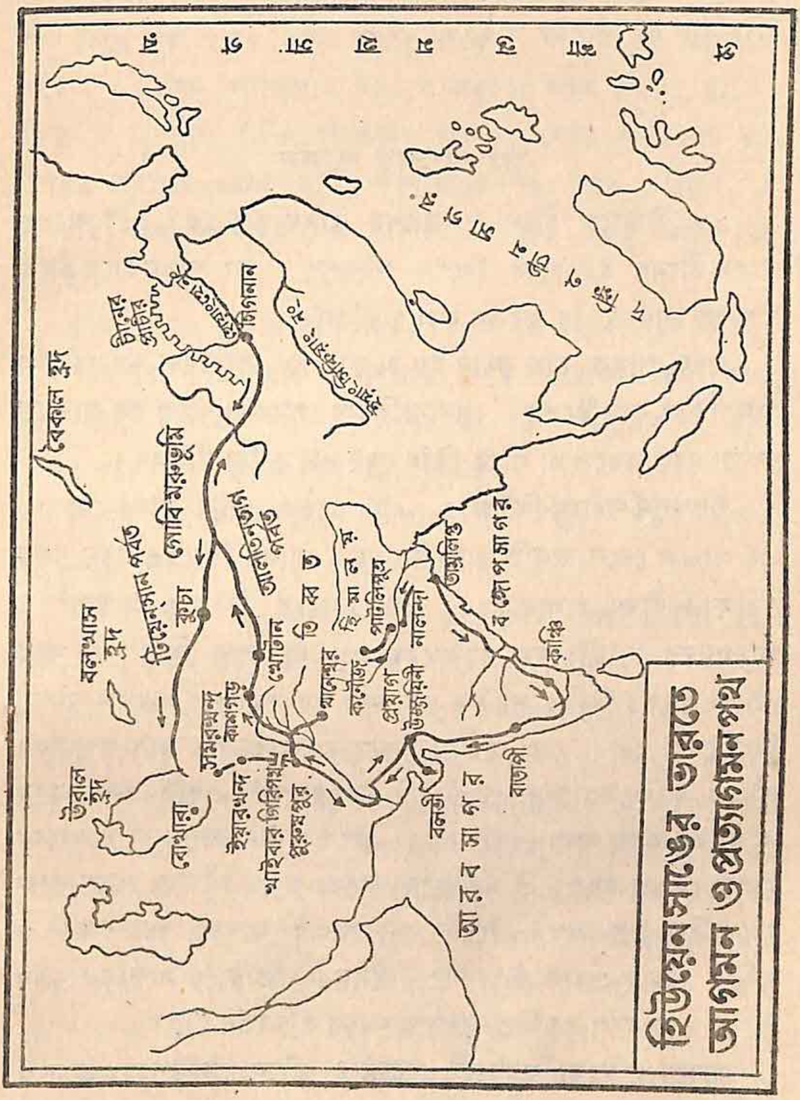


হিউয়েন-সাঙ্

পথ খুঁজে পান। মরুভূমির পর আসেন তুষারগিরির কাছে। তুষারপাতে তাঁর বার চৌদ্দ জন সঙ্গী প্রাণ হারান। অদম্য হিউয়েন-সাঙ্ একাকী এগিয়ে যান, তুর্কীস্থানে এসে পৌঁছান। তুর্ক রাজা তাঁকে সমাদর করেন, তুর্কীস্থানের পর হিউয়েন-সাঙ্ আসেন বিখ্যাত বাণিজ্যকেন্দ্র সমরখন্দে। তারপর কপিশা থেকে ভারতে প্রবেশ করেন। ঐ তুর্ক রাজা কপিশা পর্যন্ত হিউয়েন-সাঙ্‌কে প্রহরীর সাহায্য দিয়েছিলেন।

হিউয়েন-সাঙ্ দীর্ঘ ১৪ বছর ভারতের নানা দেশ ঘুরে বেড়ান। খাইবার গিরিপথ দিয়ে ভারতে প্রবেশের পর তিনি দু বছর কাশ্মীরে অবস্থান করেন। তিনি বহু প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষ দেখেন। নালন্দায় পাঁচ বছর অধ্যয়ন করেন। তারপর কনৌজে হর্ষবর্ধনের দরবারে উপস্থিত হন। তিনি পূর্বদিকে কামরূপ, দক্ষিণে পল্লব রাজধানী কাঞ্চী এবং চালুক্যরাজধানী বাদামী বা বাতাপি নগরে গমন করেন। পল্লবরাজ নরসিংহবর্মন ও চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশী হর্ষবর্ধনের মতই তাঁকে সমাদর জানান। মালব, বলভী প্রভৃতি রাজ্যেও তিনি গমন করেন। তিনি নেপাল থেকে সিংহল পর্যন্ত ভারতের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করেন। ১৪ বছর ভারতে অবস্থানের পর হিউয়েন-সাঙ্ খাইবার গিরিপথ পার হয়ে মধ্য এশিয়ার খোটান হয়ে গোবি মরুভূমি পার হয়ে ৬৪৫ খ্রীস্টাব্দে তিনি সিয়ান্-ফুতে গিয়া পৌঁছান।

হিউয়েন-সাঙের ভ্রমণের গুরুত্ব: হিউয়েন-সাঙের ভারত ভ্রমণ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তিনি ভারত থেকে বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রের বহু পাণ্ডুলিপি, বুদ্ধের দেহাস্থি ও ভারতের শিল্প-নিদর্শনের কয়েকটি চিত্র চীনে নিয়ে যান। সম্রাট তাই সুং-এর অনুরোধে হিউয়েন-সাঙ্ তাঁর ভ্রমণ কাহিনী লেখেন। ঐ ভ্রমণবৃত্তান্ত থেকে আমরা সেই সময়ের ভারতের অবস্থা, হর্ষবর্ধন, নরসিংহবর্মন, দ্বিতীয় পুলকেশী, নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়, ভারতের সমাজব্যবস্থা, রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে জানতে পারি। হিউয়েন-সাঙের ভারত-ভ্রমণের পর চীনদেশে



হিউয়েন সাঙের ভারতে আগমন ও প্রত্যাগমন পথ

বৌদ্ধধর্ম প্রসার লাভ করে। পরে বহু ভারতীয় বৌদ্ধ ভিক্ষুও চীনে যান। বৌদ্ধধর্মকে কেন্দ্র করে চীন ও ভারতের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সাংস্কৃতিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

সুং বংশের শাসন

৯৬০ খ্রীস্টাব্দে চীনে সুং বংশের শাসন শুরু হয়। এই বংশের শাসন চীনের ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সুং শাসনকালে চীনে বহু গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার প্রবর্তন করা হয়েছিল।

প্রথম শাসক চাও-কুয়ান-ইন বা তাই সুং সামরিক কর্মচারীদের ক্ষমতা হ্রাস করেছিলেন। সেনাবাহিনীর লোকেরা যাতে বল-প্রয়োগে ক্ষমতা দখল করতে না পারে তিনি সেই ব্যবস্থা নিয়েছিলেন।

গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা: এই বংশের তৃতীয় রাজা সেং সুং-এর আমলে দেশে সংহতি প্রতিষ্ঠিত হয়। শাসন বিষয়েও নতুন নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান হয়। বংশ-পরিচয়ের ভিত্তিতে বা উচ্চপদস্থ আমলাদের আত্মীয়দের সরকারের বড় বড় পদে নিয়োগ না করে বর্তমানকালের সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার মত পরীক্ষার মাধ্যমে আমলা নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়। বাধ্যতামূলক শ্রমদান হ্রাস করা হয়। পতিত জমি উদ্ধারের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হয়। খাল খনন আর সংস্কারের ওপর নজর দেওয়া হয়। দেশে আইন-কানুনের সংস্কারের ব্যবস্থা নেওয়া হয়। ঐ সব ব্যবস্থা যাদের স্বার্থে আঘাত লাগে তারা বিরোধিতা শুরু করে। সম্রাট সেং সুং-এর আমলে বিখ্যাত কবি ও পণ্ডিত ওয়াং প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন। তিনি যে সংস্কার প্রবর্তন করেন তার ফলে প্রচলিত ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আসে।

ব্যবসা-বাণিজ্যে সরকারী প্রচেষ্টা: চীনে ইতিপূর্বে কখনও সরকার অর্থনৈতিক উন্নতির প্রতি আত্মনিয়োগ করেনি। ওয়াং অর্থনৈতিক পরিকল্পনার জন্য একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন অর্থনৈতিক দপ্তরের প্রতিষ্ঠা করেন।

ঐ সময়ে সরকার ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত হয়ে পড়ে। ব্যবসা-বাণিজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রণে আসে। কোন একটি বিশেষ স্থানের পণ্য কিনে অন্য স্থানে বিক্রী করতে থাকে। পণ্যের দর ওঠানামা করে না। তবুও বাণিজ্যের মাধ্যমে সরকার লাভ করতে থাকে। কিন্তু ঐ ব্যবস্থায় ব্যক্তি বিশেষের ব্যবসার কোন ক্ষতি হয় না। উপরন্তু সরকার ছোট ছোট ব্যবসায়ীকে ঋণ দিতে থাকে। ঐ ব্যবস্থার সঙ্গে বর্তমানকালের বাণিজ্য ব্যবস্থার কিছু কিছু মিল আছে।

কৃষি ঋণঃ কৃষি ঋণদান সরকারের আরও উল্লেখযোগ্য কীর্তি। বীজ বুনিবার সময় চাষীদের সরকার থেকে প্রয়োজনে ঋণ দেওয়া হয়। ফলে চাষীরা প্রয়োজনে ঋণের জন্য ধনী ও মহাজনদের ওপর নির্ভর করে না। সুদের হার ছিল সামান্য।

চীনের বিভিন্ন শহরে শস্যাগার তৈরী করা হয়। জরুরী প্রয়োজনে ঐসব শস্যাগার থেকে শস্য যোগান হত।

কর ব্যবস্থাঃ সুং আমলে সুষ্ঠু কর ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। ধনী দরিদ্র সকলকেই সরকারকে কর দিতে হত। কিন্তু কর নির্ধারণে অবিচার ছিল না। জমি পরিমাপ করে জমির আয়তন আর উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ অনুসারে কর আরোপ করা হত। স্বার্থে আঘাত লাগায় বড় বড় জমির মালিক, বড় বড় ব্যবসাদার আর ধনী মহাজনরাও সংস্কারের বিরোধিতা করে। একশ্রেণীর আমলারাও ভিতরে ভিতরে বিরোধিতা করতে থাকে। ঐ সব সংস্কার কনফুসিয়াসের আদর্শের বিরোধী—এই বলে অভিযোগ আসে। সরকার লাভজনক ব্যবসায় লিপ্ত হবে, সাধারণ মানুষের জীবনে হস্তক্ষেপ করবে—এ অবস্থা চলতে দেওয়া চলে না—এই ছিল বিরোধীদের কথা।

শিক্ষা ও সংস্কৃতিঃ সুং আমলে এত পরিবর্তন এসেছিল যে সুং যুগে চীনে 'আধুনিক যুগের' লক্ষণ ছিল কিনা সেই বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। ঐ সময় চীনের লোকসংখ্যা ছিল পৃথিবীর সব দেশের চেয়ে বেশী—১০০,০০০,০০০ বেশী। ঐ

বিপুলসংখ্যক লোককে খাবার যোগানোর জন্য ধান-চাষে যে পরিবর্তন এসেছিল তা বিস্ময়কর। মাত্র ১০০ দিনের মধ্যে ধান তৈরী হবার বিদ্যে চীনের মানুষ আয়ত্ত করে।

তূলো, রেশম চাষেরও উন্নতি হয়। রেশমের মানেরও উন্নতি হয়। নানারকম যন্ত্রপাতির আবিষ্কার হয়।

শুধু যে কৃষির সাহায্যে মানুষের জ্ঞান বেড়েছিল তা নয়—চিকিৎসা বিদ্যায়ও অভাবনীয় উন্নতি হয়। আকুপাংচার (সূঁচের মাধ্যমে চিকিৎসা), ধাত্রী বিদ্যা, দন্ত রোগের চিকিৎসা, চক্ষু রোগ, বাতজ ব্যাধির চিকিৎসার উন্নতি হয়। নব কনফুসিয়বাদের ফলে মানুষ বিজ্ঞানের ওপর নির্ভর করতে থাকে। মানুষের মধ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী জন্মায়।

সু আমলে দেশের সর্বত্র বহু বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছিল। শিক্ষার প্রসার হয়েছিল। ছাপাখানার প্রসার, ব্লকের ব্যবহারের ফলে বহু বই ছাপা সম্ভব হয়। বই-এর দাম কমে যায়।

একদল পণ্ডিত প্রাচীন শিক্ষা ও সংস্কৃতির চর্চা অব্যাহত রাখেন। প্রত্নতত্ত্ব, কবিতা, গীতি-কবিতারও যথেষ্ট উন্নতি হয়। ইতিহাস, বিভিন্ন সংকলন, বিশ্বকোষ প্রণয়ন করা হয়। শিল্প-কলারও অভাবনীয় উন্নতি হয়।

চীনে উয়ান বংশের শাসন

চীনে উয়ান বংশের শাসন বলতে মোঙ্গলদের শাসন বোঝায়। মোঙ্গলরা ছিল মধ্য এশিয়ার যাযাবর উপজাতি। দ্বাদশ শতকের শেষ দিকে মোঙ্গল নেতা চেঙ্গিজ খাঁ মোঙ্গলদের বিভিন্ন শাখাকে ঐক্যবদ্ধ করে এক দুর্ধর্ষ জাতিতে পরিণত করেন।

মোঙ্গলগণ মাঞ্চুরিয়ার কিন সম্রাটকে পরাজিত করেন। ১২১৪ খ্রীস্টাব্দে পিকিন অধিকার করেন। খোয়ারিজম, বলখ, বোখারা, সমরখন্দ, তাসখন্দ প্রভৃতি মোঙ্গলগণ দখল করে। চেঙ্গিজ খাঁ

যখন মারা যান তখন মোঙ্গল-সাম্রাজ্য মাঞ্চুরিয়া, মোঙ্গোলিয়া, তুর্কীস্থান, আফগানিস্থান, বেলুচিস্তান, খোরাসান, পারস্য ও দক্ষিণ রাশিয়া পর্যন্ত প্রসারিত ছিল।



চেঙ্গিজ খাঁ

চেঙ্গিজ খাঁর এক পৌত্র ছিলেন হুলাগু। তিনি ছিলেন পারস্যের শাসনকর্তা, হুলাগুর ভাই কুবলাই খাঁ ছিলেন চীনের শাসনকর্তা। তিনি পিকিন্ শহরে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন ; ঐ সময় থেকে মোঙ্গল-সাম্রাজ্যের প্রত্যেক অংশ হয়ে যায় স্বতন্ত্র ও স্বাধীন।

কুবলাই খাঁর অনেক চীনা উপদেষ্টা ছিলেন। তাঁরা কুবলাই খাঁকে চিরাচরিত চীনা সম্রাটের ভূমিকা নিতে বলেন। ১২৭১ খ্রীস্টাব্দে উয়ান্ নামকরণ করা হয় এবং কুবলাই খাঁ চীনের উয়ান্ শাসনের সূচনা করেন।



কুবলাই খাঁ

কুবলাই খাঁর রাজত্বকালের দুটি বিষয় উল্লেখযোগ্য—তিব্বতী বৌদ্ধ ধর্ম ও মার্কোপোলোর পিকিন্ ভ্রমণ।

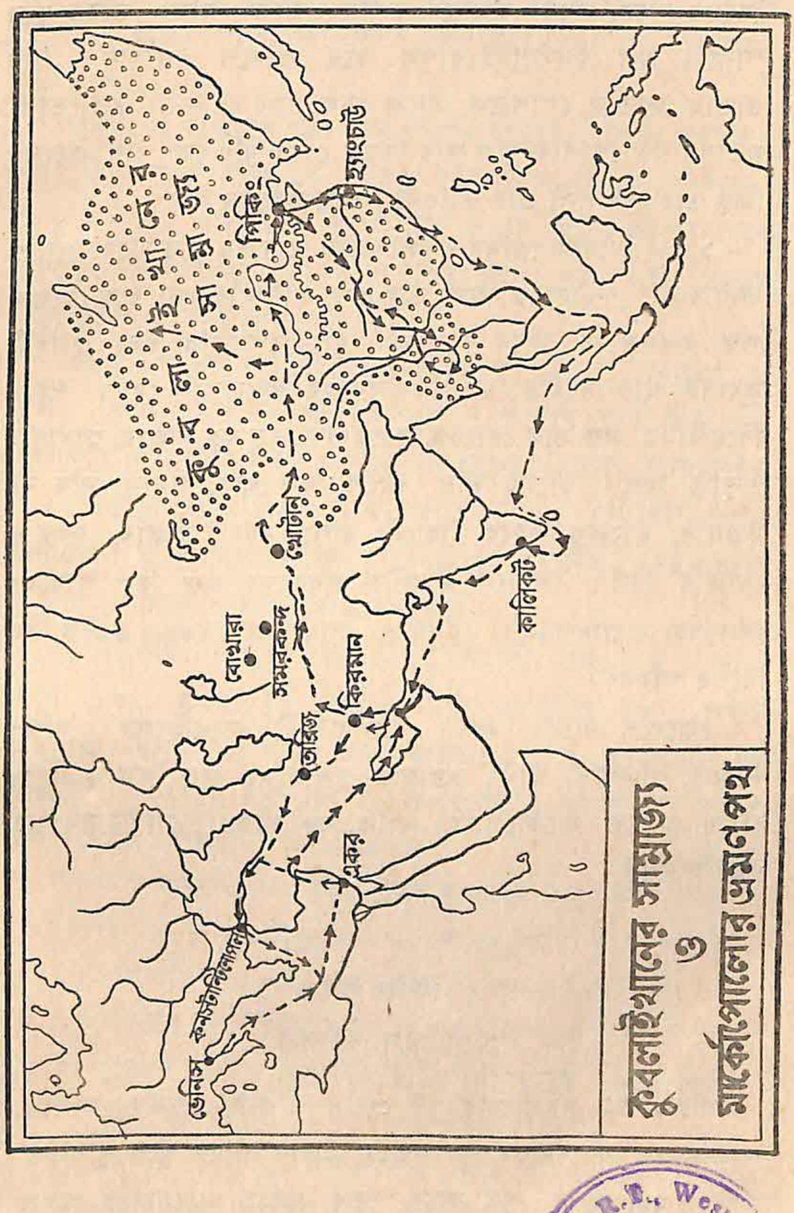
তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্ম : অষ্টম শতকে প্রসিদ্ধ বৌদ্ধপণ্ডিত এবং নালন্দার অধ্যক্ষ শান্তিরক্ষিত তিব্বতের রাজার আমন্ত্রণে সে দেশে যান এবং সেখানের বৌদ্ধ-ধর্ম সংস্কার করেন। তিনি এবং পদ্মসম্ভব তিব্বতের বিখ্যাত লামা সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেন। লামার অর্থ মঠের কর্তা। ১০৩৮ খ্রীস্টাব্দে

অতীশ দীপঙ্কর তিব্বতে যান এবং বৌদ্ধধর্মে বিশেষ সংস্কার করেন।

ত্রয়োদশ শতকে কুবলাই খাঁ তিব্বত জয় করেন। তিনি কনফুসিয়ান, খ্রীস্টান, মুসলমান ও তিব্বতের বৌদ্ধ লামাদের দরবারে আমন্ত্রণ করে পরীক্ষা করেন। পরীক্ষার পর তাঁর মনে হয় তাঁর সাম্রাজ্যের ঐক্য বজায় রাখার জন্য বৌদ্ধধর্ম বেশী উপযোগী। তিনি তিব্বতের শাক্য লামাকে প্রধান আচার্যের পদে বরণ করেন। শাক্য লামা কুবলাই খাঁকে রাজ্যে অভিষিক্ত করতে রাজী হন, বিনিময়ে সারা তিব্বতের শাসনভার পান। পরবর্তীকালে রাজনৈতিক পরিবর্তনের ফলে তিব্বতে শাক্য লামার প্রভাব কমে যায়। পঞ্চদশ শতকে তিব্বতে অবতারবাদ প্রচার করা হয়। সপ্তদশ শতকে 'দলাই' লামা পদের সৃষ্টি হয়।

মার্কোপোলোর ভ্রমণ বৃত্তান্তঃ মার্কোপোলো ছিলেন ইটালীর ভেনিসের অধিবাসী এবং বিখ্যাত পর্যটক। তাঁর বাবা ও কাকা ছিলেন বণিক। তাঁরা দুজনে বোখারায় আসেন তারপর চীনে কুবলাই খাঁর দরবারে হাজির হন। কুবলাই খাঁর অনুরোধে তাঁরা স্বদেশ থেকে একশ জন খ্রীস্টান মিশনারী চীনে নিয়ে আসার জন্য স্বদেশে যান। তাঁরা চীনে মিশনারী নিয়ে যেতে না পারলেও সতের বছরের মার্কোপোলোকে সঙ্গে নিয়ে দ্বিতীয়বার চীনে আসেন। মার্কো দীর্ঘ ষোল বছর চীনে ছিলেন এবং কুবলাই খাঁ তাঁকে নানা সরকারী পদে নিয়োগ করেন। মার্কো চীনের হ্যাং চাও-এর শাসনকর্তার পদও পেয়েছিলেন। পারস্যরাজের


মার্কোপোলো


কুবলাইখানের সাম্রাজ্য
ও
মার্কোপোলোর ভ্রমণপথ
পিকিং
হ্যাংচাউ
খোতান
বোখারা
সমরকন্দ
কিরমান
তাব্রিজ
একর
কনস্টান্টিনোপল
ভেনিস
কালিকট

সঙ্গে এক মঙ্গোল রাজকুমারীর বিয়ে উপলক্ষে রাজকুমারীর রক্ষী সৈন্যের সঙ্গে মার্কো জলপথে সুমাত্রা, জাভা, দক্ষিণ ভারত ঘুরে পারস্যে এবং কনস্ট্যান্টিনোপল হয়ে স্বদেশে পৌঁছান। তাঁর তাতার জাতীয় পোশাকে তাঁকে চেনা সম্ভব হয় না। এক ভোজ-সভায় তিনি পোশাক খুলে তার ভিতর থেকে মণি-মুক্তা বার করেন। কিন্তু তাঁর দেশবাসী তাঁর কাহিনী বিশ্বাস করতেন না।

১২৯৮ খ্রীস্টাব্দে ভেনিস ও জেনোয়ার মধ্যে এক যুদ্ধে মার্কোপোলো বন্দী হন। বন্দীদশায় মার্কো তাঁর ভ্রমণ-কাহিনীর কথা বলে যেতেন, অন্য একজন তা লিখে নিতেন। মার্কোপোলোর ভ্রমণ কাহিনী কুবলাই খাঁর দরবার ও পিকিন্ শহরের সুন্দর বর্ণনা দেয়। শহরে বিদেশীদের জন্য ভাল হোটেল, সরাইখানা, বড় বড় বাজার, স্নানাগার প্রভৃতি ছিল। চীনের নানা অংশে ছিল ক্ষেত, বাগান, বৌদ্ধ মঠ ইত্যাদি, হ্যাংচাও শহরে বাঁধানো রাস্তা, নর্দমা, বাজার, বন্দর ও দোকান ছিল। সেখানে ভারতীয় বণিকদের জন্য ছিল পাথরের গুদামঘর ও স্নানাগার। রেশম ও সোনার জরি দেওয়া কাপড় ছিল বিশেষ আকর্ষণ।

ব্রহ্মদেশে মার্কো বিশাল হাতীবাহিনী দেখেছিলেন। দক্ষিণ ভারতে শক্তিমতী রানী রুদ্রাম্বার সুশাসনের জন্য খ্যাতি ছিল। দক্ষিণ ভারতে মার্কোপোলো নাকি বহু ভারতীয় যোগীর সংস্পর্শে এসেছিলেন।

দ্বিতীয় পর্ব

মধ্য যুগে জাপান

পরিচিতি ঃ দূরপ্রাচ্যের দুই প্রধান শক্তির অন্যতম জাপান। জাপান এশিয়া মহাদেশের অন্যতম প্রধান শক্তি বলে পরিচিত। এশিয়া মহাদেশের পূর্ব অংশে উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরে অসংখ্য দ্বীপের সমন্বয়ে জাপান গঠিত। ঐ সকল দ্বীপের মধ্যে হনশিউ,

হোক্কাইডো, কিউসিউ ও শিককু প্রধান। জাপানের বাসিন্দাদের জাপানী বলে। তারা জাপানকে বলে 'দাই নিপ্পন' বা 'উদীয়মান সূর্যের দেশ'।

জাপানের ইতিহাস প্রায় তিন হাজার বছরেরও বেশী পুরানো। জাপানীরা মনে করত যে তাদের শাসকবংশ সূর্য থেকে উদ্ভুত। কিন্তু ইতিহাস বলে ৬৬০ খ্রীস্টপূর্বাব্দে সম্রাট হিম্মুর আমল থেকে জাপানে সম্রাটদের শাসনের সূত্রপাত হয়। জাপানীরা তাদের সম্রাটকে বলে মিকাডো।

একদল পণ্ডিতের মতে জাপানীদের পূর্বপুরুষেরা কোরিয়া ও মালয় থেকে জাপানে আসে। প্রথমে জাপান নাম ছিল না। এখনকার জাপানের কতক অংশকে বলা হোত যামাতো, আনুমানিক ৫০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দে যামাতো রাজ্য স্থাপিত হয়। কোরিয়ার সঙ্গে যামাতোর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। কোরিয়ার মাধ্যমেই চীনের সভ্যতা ও ভাষা যামাতো বা জাপানে প্রবেশ করে।

খ্রীস্টীয় সপ্তম শতকে যামাতো শক্তিশালী হয়ে ওঠে। সারা দেশে ঐক্য, সংহতি ও কেন্দ্রীয় শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমে রাজধানী ছিল নারা নামে এক জায়গায়, পরে রাজধানী হয় কিয়াটো। বর্তমান রাজধানী টোকিওর আগে পর্যন্ত প্রায় ১১০০ বছর জাপানের রাজধানী ছিল কিয়াটো।

সমাজ ও সামন্ততান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ঃ তোমরা ইতিপূর্বে ইওরোপের যে সামন্ত-প্রথা সম্বন্ধে জেনেছ তার সঙ্গে মধ্যযুগের জাপানের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার যথেষ্ট মিল ছিল।

প্রাচীনকালে জাপানের সমাজ অনেকগুলি শাখায় বিভক্ত ছিল ; আর মধ্যযুগে জাপানের সমাজ প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত ছিল— (১) শাসক (২) শাসিত।

শাসকসমাজ প্রধানতঃ আমলাদের নিয়ে গঠিত ছিল। অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে সরকারী গুরুত্বপূর্ণ পদগুলি বংশানুক্রমিক হয়ে পড়ে। তারা ধান জন্মে এমন জমিগুলি (Rice lands)

ভোগ করত; কিন্তু কর দিত না, বাকী ধান-চাষের জমি অন্যান্য লোকদের মধ্যে বণ্টন করা হত। মাঝে মাঝে ঐ জমি নতুন করে বণ্টন করা হত। কালক্রমে ধান-চাষ যোগ্য জমি মুষ্টিমেয় লোকের দখলে থাকে। কেবল ঐ প্রকার জমির উপর কর আরোপ করা হত, ফলে করের হার খুব উঁচু ছিল। অন্যান্য জমি ছিল করমুক্ত। করের হার খুব বেশী হওয়ায় সাধারণ চাষীরা জমি ছেড়ে দিতে বাধ্য হত। চাষীরা মাঝে মাঝে বিদ্রোহী হয়ে উঠত। জাপানের ইতিহাসে অনেক কৃষি-বিদ্রোহের উল্লেখ আছে। ঐ সব জমি যোদ্ধাশ্রেণীর মধ্যে বণ্টন করা হত। তারা কর দিত না ফলে যারা কর দিত তাদের ওপর করের বোঝা বাড়ত। এইভাবে কেন্দ্রের ক্ষমতা কমে যায় আর জমিদারদের শক্তি বেড়ে যায়।

জমি বণ্টন ব্যবস্থায় ফলস্বরূপ যোদ্ধা শ্রেণীর উৎপত্তি হয়। যে সব চাষী জমি ত্যাগ করতে বাধ্য হয় যোদ্ধাদের সাহায্যে তারা জমি চাষ করতে থাকে। যে জমি তাদের দখলে ছিল তার ওপর দখল বজায় রাখতে আর নতুন জমি দখল করার জন্য শক্তির দরকার ছিল।

জমি বণ্টন ব্যবস্থার ফলে কালক্রমে জাপানে বেসামরিক আমলাগোষ্ঠী আর সামরিক অভিজাত সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। প্রথম সম্প্রদায়ের প্রভাব ছিল সম্রাট আর কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থার ওপর আর শেষোক্ত সম্প্রদায়ের প্রভাব ছিল আঞ্চলিক। কেন্দ্রের ক্ষমতা কমতে কমতে ত্রয়োদশ শতকে বিকেন্দ্রীকরণ সম্পূর্ণ হয়ে যায়। মধ্য যুগের প্রথম দিকে জাপানে মিকাডো, অর্থাৎ সম্রাটের যে প্রভাব বজায় ছিল তা কমতে থাকে।

চীনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা: জাপানের সভ্যতার নানা অংশে চীনের সভ্যতার প্রভাব সুস্পষ্ট। প্রাচীনকাল থেকে চীনের সঙ্গে জাপানের সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠ। জাপানের ওপর চীনের প্রভাবের সবচেয়ে বড় নিদর্শন জাপানের লিপি। জাপানের ভাষা চীনা ভাষা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন হলেও জাপানের লিপি চীনের লিপির কাছে ঋণী।

চীনের লিপি চিত্রলিপি—জাপানের লিপি চীনের লিপির মত কিন্তু তার সঙ্গে জাপানীরা চীনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কিছু সংযোজন করেছে।

চীন ও জাপানের ভাষা সম্পূর্ণ ভিন্ন কিন্তু লিপির সাহায্যে এক দেশের ভাষা অন্য দেশের লোক বুঝতে পারে।

প্রাচীন জাপানের সাহিত্যেও চীনের প্রভাব সুস্পষ্ট। জাপানের কয়েকজন প্রথম দিকের লেখক চীনা ভাষায় জাপানী সাহিত্য রচনা করেছিলেন।

জাপানের পণ্ডিতেরা চীনদেশে গিয়ে কনফুসিয়াসের দর্শন সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করেন। অবশ্য রূপকথা, ইতিহাস ও কবিতা রচনার সাথে সাথে জাপানের সাহিত্য নিজস্ব ধারায় গড়ে উঠতে থাকে।

চীন থেকেই জাপানে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়। অবশ্য চীন থেকে প্রথমে কোরিয়াতে পরে কোরিয়া থেকে জাপানে বৌদ্ধধর্মের প্রসার হয়। জাপানের বৌদ্ধ পণ্ডিতেরা চীনে গিয়ে বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে পড়াশুনা করতেন। পরে জাপানে বৌদ্ধধর্ম ব্যাপকভাবে প্রসারিত হয় আর জাপানের নিজস্ব ধারায় বৌদ্ধধর্ম গড়ে ওঠে, জাপানের বৌদ্ধধর্ম জেন বৌদ্ধধর্ম নামে খ্যাত। এই রীতিতে আচার-অনুষ্ঠানের চেয়ে ধ্যান করার ওপর বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়।

জাপানের সভ্যতা ও সংস্কৃতি চীন ও কোরিয়ার থেকে এলেও জাপানে ঐ সভ্যতা ও সংস্কৃতি নতুন বৈশিষ্ট্য নিয়ে গড়ে ওঠে। চীনারা সৈনিকদের কোনদিনই সমাজে বড় স্থান দেয়নি, ব্যবসায়ীদের স্থান ছিল উঁচুতে, কিন্তু জাপানে সৈনিকগোষ্ঠীই ছিল শ্রেষ্ঠ আসনের অধিকারী।

মিকাডো ও শিন্তোধর্ম ঃ—জাপানের আদি ধর্মের নাম শিন্তোধর্ম। শিন্তোধর্মের অর্থ দেবতার পথ। এই ধর্মে প্রকৃতি ও পূর্বপুরুষদের পূজার সংমিশ্রণ দেখা যায়। এই ধর্মের মূল কথা বর্তমানের শোভা আর অতীতের স্মৃতি।

তোমরা আগেই জেনেছ যে জাপানীরা তাদের সম্রাট অর্থাৎ মিকাডোকে সূর্যের বংশধর বা দেবতারূপে দেখেন। মিকাডো

নিজের সম্মান বজায় রাখার জন্য নিজেকে শিন্তোধর্মের প্রধান পুরোহিতরূপে প্রচার করতেন। শিন্তোধর্মের জোরে সেকালে জাপানে মিকাডো আর মুষ্টিমেয় লোকের প্রতি আনুগত্য স্থাপনের প্রচেষ্টা করা হয়। কিন্তু জাপানে জমিদারদের (দাইমিও) শক্তি বেড়ে যাওয়ায় আর তাদের আচরণ আর তার সঙ্গে শোজা বংশের আমলে বৌদ্ধধর্ম প্রবল হয়ে ওঠার পর মিকাডো ও কেন্দ্রীয় শক্তির ক্ষমতা হ্রাস পায়। কালক্রমে মুষ্টিমেয় কয়েকটি অভিজাত বংশ জাপানে প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ওঠে। শোজা বংশের শাসনের কিছু পরে জাপানে 'ফুজিওয়ারা' নামে এক জাপানী প্রধান বংশের প্রভাব শুরু হয়। সম্রাট তাদের পুতুলে পরিণত হন।

সোগান যুগ ঃ—জাপানে ফুজিওয়ারা বংশ বহুদিন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু দ্বাদশ শতকে জাপানে তাইরা আর মিনামোতো নামে দুটি শক্তিশালী দাইমিও বা জমিদার বংশের উদ্ভব হয়। মিনামোতো পরিবারের যোরিতোমো জাপানের সবচেয়ে শক্তিশালী শাসনকর্তা হয়ে ওঠেন। তখনকার মিকাডো তাঁকে সোগান বা প্রধান সেনাপতি উপাধিতে ভূষিত করেন। এরপর থেকে সোগান উপাধি উত্তরাধিকারসূত্রে দীর্ঘকাল ধরে চলতে থাকে। সোগানরাই হয়ে ওঠে জাপানের প্রকৃত শাসনকর্তা। সম্রাটের হাতে কোন ক্ষমতা থাকে না—তিনি রাজধানী কিয়াটোয় বাস করতে থাকেন।

প্রায় সাতশ বছর ধরে বিভিন্ন বংশের সোগানরা জাপান শাসন করতে থাকে। প্রথম সোগান যোরিতোমো কামাকুরাতে তাঁর সামরিক রাজধানী স্থাপন করেন। এই যুগের সোগানদের বলে কামাকুরা সোগান। এই যুগে জাপানে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপিত হয়।

১৩৩৮ খ্রীস্টাব্দে জাপানে আশিকাগা নামে একটি নতুন সোগান বংশের শাসন শুরু হয়। ঐ সময় চীনে বিখ্যাত মিঙ্ বংশ রাজত্ব করত।

তারপর জাপানে শুরু হয় গৃহযুদ্ধ, গৃহযুদ্ধের পর তোকুগাওয়া ইয়েযাশু সোগান হন। তিনি জেদো নগরের প্রতিষ্ঠা করেন যা

বর্তমানের রাজধানী টোকিও নগরী। এই বংশের শাসনকালে জাপানে বিদেশীদের আগমন ও জাপানীদের বিদেশে গমন নিষিদ্ধ করা হয়। প্রায় দুশ বছর ঐ নীতি স্থায়ী হয়।

সোগান যুগের শেষ ভাগে জাপানের সমাজে সামুরাই (জমিদার বা দাইমিও, পদস্থ কর্মচারী, সাধারণ সৈনিকসহ) ছিল প্রধান। অবশ্য সাধারণ সৈনিকদের কোনও সুযোগ-সুবিধা ছিল না। সামুরাই-এর পরে ছিল চাষী, তারপর ছিল শিল্পী আর সবশেষে ছিল ব্যবসায়ীদের স্থান।


একজন সামুরাই

সামুরাই ঃ—মধ্যযুগে জাপানে জমিদার বা দাইমিও ছাড়া সামুরাই নামে এক শক্তিশালী সম্ভ্রান্ত সামরিক সম্প্রদায় ছিল। দেশে তাদের যথেষ্ট প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল। তারা একজন অপরজনের সঙ্গে যুদ্ধ করে জমিদারি বাড়াবার চেষ্টা করত। সামুরাইদের মধ্যে যে সবচেয়ে শক্তিশালী হয়ে উঠত—মিকাডোর পক্ষে তার পরামর্শ না মানা উপায় ছিল না। সামুরাইরা এরপরে দেশের জন্য প্রাণ দিতেও কুণ্ঠাবোধ করত না।

জাপানীদের শৌর্য ঃ—সামুরাইগণ প্রয়োজনে যুদ্ধ করত আর শান্তির সময়ে শিকার আর যুদ্ধবিদ্যা শিখে সময় কাটাত। যুদ্ধ এবং যুদ্ধের মহড়ার ফলে সামুরাইদের মধ্যে বীরত্বের আদর্শ (Chivalry) প্রকাশ পায়। বংশ গৌরব ও ঊর্ধ্বতন প্রভুর প্রতি আনুগত্য দানা বাঁধতে থাকে ; যাহার ফলে কালক্রমে যোদ্ধাদের আচরণবিধি বা বুসিডোর (Bushido) সৃষ্টি হয়।

সামুরাই পরিবারে স্ত্রী-জাতির সম্মান বিশেষ উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

অনুশীলনী

(ক) ১। চীনে তাং বংশের শাসনকালে যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল সে বিষয়ে লেখ।

২। তাং আমলে চীনে আইন সংকলনের বিষয় আলোচনা কর।

৩। তাং যুগে চীনের শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা কর।

৪। তাং আমলে চীনের শিল্প সম্বন্ধে যা জান লেখ।

৫। তাং শাসনকালে চীনে ব্যবসা-বাণিজ্য ও কৃষির উন্নতির বিষয় লেখ।

৬। হিউয়েন-সাঙের ভারত ভ্রমণের ইতিহাস লেখ।

৭। চীনে সুং বংশের শাসনকালে যেসব গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছিল সে সম্বন্ধে যা জান লেখ।

৮। সুং শাসনকালে চীনের শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা কর।

৯। চীনে উয়ান্ বংশের শাসনের ইতিহাস আলোচনা কর।

১০। তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে কি জান?

১১। মার্কোপোলো কে ছিলেন? তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্ত সম্বন্ধে যা জান লেখ।

১২। জাপানের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে যা জান লেখ।

১৩। মধ্য যুগে জাপানের সমাজ ও সামন্ততান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা কর।

১৪। চীনের সঙ্গে জাপানের ঘনিষ্ঠতার বিষয় আলোচনা কর।

১৫। মিকাডো ও শিন্তোধর্ম সম্বন্ধে যা জান লেখ।

১৬। জাপানে সোগান যুগের বিষয় আলোচনা কর।

(খ) **সংক্ষেপে উত্তর দাও:—**

১। তাং যুগে চীনের সাহিত্যের বিষয় উল্লেখ কর।

২। চীনে ছাপাখানা আবিষ্কারের বিষয় যা জান লেখ।

৩। মধ্য যুগে চীন কেন অন্যান্য দেশের কাছে আদর্শ হয়ে ওঠে?

৪। হিউয়েন-সাঙের ভারত ভ্রমণের গুরুত্ব কি ছিল?

৫। সুং শাসনকালে চীনে কর ব্যবস্থা কিরূপ ছিল?

৬। চীনে কোন্ জাতির শাসন উয়ান বংশের শাসন নামে পরিচিত? কিভাবে উয়ান নামকরণ করা হয়?

৭। মার্কোপোলোর ভ্রমণপথ সম্বন্ধে উল্লেখ কর।

৮। মার্কোপোলোর ভ্রমণবৃত্তান্ত থেকে কি জানা যায়?

৯। জাপানের লিপির সঙ্গে চীনের লিপির সম্পর্ক সম্বন্ধে কি জান ?

১০। জাপানের সাহিত্যে চীনা সাহিত্যের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা কর।

১১। জাপানে কিভাবে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয় ?

১২। জাপানের শিন্তোধর্ম সম্বন্ধে কি জান ?

১৩। 'সামুরাই' সম্বন্ধে যা জান লেখ।

১৪। 'বুসিডোর' উৎপত্তি হয় কিভাবে ?

(গ) মৌখিক প্রশ্নাবলী :—

১। দূর প্রাচ্যের প্রধান দুটি দেশের নাম বল।

২। চীনে তাং বংশের দ্বিতীয় রাজার নাম কি ?

৩। তাং আমলে চীনের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ বিদ্যালয়ের নাম বল।

৪। মধ্যযুগে চীনের সবচেয়ে বিখ্যাত কবি ও সাহিত্যিক কে ছিলেন ?

৫। কোথায় সর্বপ্রথম 'চা' এর ব্যবহার শুরু হয় ?

৬। মধ্যযুগে চীন থেকে প্রধানতঃ কোন্ কোন্ পণ্য রপ্তানী করা হয় ?

৭। হিউয়েন-সাঙের সমসাময়িক চীন-সম্রাট কে ছিলেন ?

৮। হিউয়েন-সাঙ কি উদ্দেশ্যে ভারতে এসেছিলেন ?

৯। বারুদ, কাগজ ও ছাপাখানা সর্বপ্রথম কোন্ দেশে ব্যবহার করা হয় ?

১০। হিউয়েন-সাঙের সমসাময়িক তিন জন ভারতীয় শাসকের নাম বল।

১১। চীনে কোন্ বংশের শাসনকালে কৃষি-ঋণ দান শুরু হয় ?

১২। উয়ান বংশের সবচেয়ে বিখ্যাত সম্রাট কে ছিলেন ?

১৩। তিব্বতের লামা সম্প্রদায়ের কে সৃষ্টি করেন ?

১৪। মার্কোপোলোর ভ্রমণ-কাহিনী কি ভাবে লেখা হয়েছিল ?

১৫। জাপানীরা জাপানকে কি নামে পরিচিত করে ?

১৬। যামাতো কোন্ দেশের প্রাচীন নাম ?

১৭। জাপানে কিভাবে যোদ্ধা-শ্রেণীর উৎপত্তি হয় ?

১৮। জাপানের সম্রাট কি নামে পরিচিত ?

১৯। জাপানের সমাজে কারা শ্রেষ্ঠ আসনের অধিকারী ছিলেন ?

২০। জাপানের আদিধর্মের নাম কি ?

২১। প্রথম সোগান কে ছিলেন ?

২২। কোন্ সময়ে সামুরাইগণ প্রধান হয়ে ওঠেন ?

২৩। 'বুসিডো' বলতে কি বোঝায় ?

একাদশ অধ্যায়
প্রথম পরিচ্ছেদ
মধ্য যুগে ভারত
গুপ্তোত্তর যুগের ইতিহাস

ইওরোপে রোম সাম্রাজ্যের মত ভারতে শক্তিশালী গুপ্ত সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল। প্রথম চন্দ্রগুপ্ত থেকে শুরু করে স্কন্দগুপ্ত পর্যন্ত গুপ্তবংশীয় শাসকগণের চেষ্টার ফলে গুপ্ত সাম্রাজ্যের ঐশ্বর্য, শিল্প, সাহিত্য, ভাস্কর্য, স্থাপত্য সকল বিষয়ে অভাবনীয় উন্নতি হয়েছিল।

রোম সাম্রাজ্য যেমন জার্মান ও হূণ জাতির আক্রমণে ধ্বংস হয়ে যায়, গুপ্ত সাম্রাজ্যও তেমন হূণ জাতির আক্রমণে দুর্বল হয়ে পড়ে। গুপ্তরাজ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত শকদের হারিয়ে দিয়ে 'শকারি' উপাধি নিয়েছিলেন। গুপ্ত-সম্রাট স্কন্দগুপ্ত হূণদের পরাজিত করে বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন। স্কন্দগুপ্তের পর গুপ্তসাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়ে, সেই সুযোগে হূণরা ভারতে প্রবেশ করে।

ভারতে হূণ আক্রমণঃ মধ্য এশিয়ার যাযাবর হূণ জাতি ও হূণ নেতা এ্যাটিলার কথা তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে? চীনের প্রাচীরে বাধা পেয়ে হূণরা পশ্চিম দিকে এগিয়ে গেলে মধ্য এশিয়া থেকে শক ও কুষাণরা সরে যায়। তারপর হূণদের একটি শাখা গেল পশ্চিম ইওরোপ সীমান্তে ডন ও ভল্গা নদীর তীরে আর একটি শাখা থেকে যায় অক্সু নদীর তীরে। শেষোক্ত হূণদের বলা হত 'শ্বেত হূণ'। এ্যাটিলার নেতৃত্বে দুর্ধর্ষ হূণরা যখন ইওরোপের নানা দেশে ত্রাসের সৃষ্টি করতে থাকে তার কিছুকাল পরে শ্বেত হূণরা পারস্য অধিকার করে। পারস্যের পর তারা হিন্দুকুশ পর্বত পার হয়ে গান্ধার দেশ (বর্তমান কাবুল) অধিকার করে। কাবুল জয়ের পর হূণরা কাশ্মীর জয় করে। তারপর উত্তর-পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন জনপদ আক্রমণ করে হূণরা কর আদায় করতে থাকে। হূণনেতা তোরমান কাশ্মীর,

পাঞ্জাব, কাথিয়াওয়াড়, মালব এমন কি বিহার পর্যন্ত আক্রমণ করেন। ঐ সময় পারস্য থেকে উত্তর-পশ্চিম ভারত পর্যন্ত বিশাল ভূখণ্ডে হূণরাজ্য গড়ে ওঠে।

তোরমানের ছেলে মিহিরকুল বা মিহিরগুল ছিলেন খুব নিষ্ঠুর ও অত্যাচারী। শোনা যায় যে পাহাড়ের ওপর থেকে হাতিকে ঠেলে গড়িয়ে দিয়ে হাতির করুণ মৃত্যু দেখে তিনি মজা পেতেন। মালবের দশপুরের রাজা যশোধর্মন মিহিরকুলকে পরাজিত করেন। নামেমাত্র গুপ্ত-সম্রাট নরসিংহগুপ্ত বালাদিত্যও মিহিরকুলকে পরাজিত ও বন্দী করেছিলেন। মিহিরকুলের রাজধানী ছিল শাকল বা শিয়ালকোট। মিহিরকুলের মৃত্যুর পর হূণরাজ্য দুর্বল হয়ে যায়। কিন্তু হূণ আক্রমণ মাঝে মাঝে চলতে থাকে। গুপ্ত-সাম্রাজ্যের অবসানের পর কনৌজ ও থানেশ্বরের রাজাদের হাতে হূণরা পরাজিত হয়। অক্ষু নদীর তীরে শ্বেত হূণদের প্রধান কেন্দ্র ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় এদেশে হূণ আক্রমণের কোন সম্ভাবনা থাকে না।

হূণ আক্রমণের প্রভাব: হূণদের রাজ্য নষ্ট হলেও হূণ আক্রমণের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। হূণ আক্রমণে গুপ্ত-সাম্রাজ্য এত দুর্বল হয়ে যায় যে সামন্তরা বা প্রাদেশিক শাসনকর্তারা নিজেদের স্বাধীন রাজা বলে ঘোষণা করে।

গুপ্ত-সাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন হয়ে বহু ছোট ছোট রাজ্য গড়ে ওঠে। হূণ রাজ্যের পতনের পরেও যে সব হূণ ভারতে থেকে যায় তারা ভারতকেই মাতৃভূমি বলে মনে করে। হূণ রাজারা ভারতীয় ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। রাজা তোরমান নাকি জৈনধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। রাজা মিহিরকুল ছিলেন বৌদ্ধধর্ম বিদ্বেষী। তবে তিনি নাকি ছিলেন শৈব।

এদেশে বাস করার ফলে হূণরা এদেশে বিবাহ বন্ধনে জড়িয়ে যায়—ভারতীয় জনসমাজে মিশে যায়। বহুকাল পরে মধ্যভারতে রাজপুত নামে এক বীরের জাতির উত্থান হয়। এক শ্রেণীর পণ্ডিতের মতে হূণ-গুর্জর ও দেশীয়দের মিশ্রণে ঐ জাতির সৃষ্টি হয়।

গুপ্ত-সাম্রাজ্যের ভাঙ্গন—হর্ষবর্ধনের রাজত্বকাল

গুপ্তবংশীয় সম্রাট স্কন্দগুপ্ত ছিলেন শেষ শক্তিশালী শাসক। তাঁর পরবর্তী গুপ্তরাজগণ ছিলেন দুর্বল। গুপ্তরাজগণ অর্থাৎ কেন্দ্রীয় শক্তির দুর্বলতার সুযোগে মেকল অঞ্চলের পুষ্যমিত্র উপজাতি ও মধ্য-এশিয়ার যাযাবর হূণ জাতিরা পুনঃপুনঃ আক্রমণ করতে থাকে। গুপ্ত-রাজবংশের মধ্যে তখন কলহ দেখা দেয়। প্রাদেশিক শাসনকর্তারা স্বাধীনতা ঘোষণা করে ছোট ছোট রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। এই সকল কারণে গুপ্ত-সাম্রাজ্যে ভাঙ্গন ধরে। গুপ্ত-সাম্রাজ্যের পতনের পর ভারতে আর কোন শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শক্তির অস্তিত্ব থাকে না।

স্বাধীন রাজ্যগুলির প্রতিষ্ঠা ঃ গুপ্ত-সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগে কেবল হূণরাই রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেনি আরও অনেকগুলি ছোট ছোট রাজ্যের উদ্ভব হয়েছিল। পঞ্চম শতকের শেষে ভট্টারকের নেতৃত্বে সৌরাষ্ট্রে মৈত্রক রাজ্য গড়ে ওঠে। ঐ রাজ্যের রাজধানী ছিল বলভী। এই রাজ্যের বিখ্যাত রাজা ছিলেন দ্বিতীয় ধ্রুবসেন। তিনি ছিলেন হর্ষবর্ধনের সমসাময়িক।

মৌখরীগণ কনৌজকে কেন্দ্র করে একটি শক্তিশালী রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করে। ঈশানবর্মন ছিলেন প্রথম স্বাধীন রাজা। গ্রহবর্মন ছিলেন অপর বিখ্যাত রাজা। মৌখরীগণ বহুদিন হূণদের বাধা দিয়েছিলেন।

গুপ্তবংশের পতনের যুগে মালবের দশপুর বা মান্দাশোরে যশোধর্মন একটি শক্তিশালী রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি মিহিরকুলকে পরাজিত করে বিশেষ খ্যাতির অধিকারী হন।

মালবে 'গুপ্ত' উপাধিধারী এক রাজবংশের শাসনের সূচনা হয়েছিল। ঐ বংশের দেবগুপ্ত ছিলেন হর্ষবর্ধনের সমসাময়িক।

বাংলায় গৌড় নামে শশাঙ্ক একটি শক্তিশালী স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর সঙ্গে হর্ষবর্ধনের সদ্ভাব ছিল না।

খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকের শেষে অথবা ষষ্ঠ শতকের সূচনায় পাঞ্জাবের পূর্ব প্রান্তে থানেশ্বরের পুষ্যভূতিবংশীয়গণ একটি শক্তিশালী রাজ্যের

প্রতিষ্ঠা করেন। এই বংশের প্রভাকরবর্ধন হূণদের বাধা দেন। তাঁর পুত্র হর্ষবর্ধন ছিলেন এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক।

হর্ষবর্ধন: থানেশ্বররাজ প্রভাকরবর্ধন মারা গেলে তাঁর পুত্র রাজ্যবর্ধন রাজা হন। প্রভাকরবর্ধনের জামাতা গ্রহবর্মন মালবরাজ দেবগুপ্ত দ্বারা নিহত হন। রাজ্যবর্ধনও দেবগুপ্ত ও বাংলার রাজা শশাঙ্কর শত্রুতায় নিহত হন।

ঐ পরিস্থিতিতে হর্ষবর্ধন কনৌজ ও থানেশ্বরের অমাত্যদের অনুরোধে দুটি রাজ্যেরই রাজা হন। রাজধানী হয় কনৌজ। বহু কষ্টে ভগ্নী রাজ্যশ্রীকে (গ্রহবর্মনের স্ত্রী) উদ্ধার করেন।



হর্ষবর্ধন

হর্ষ কামরূপের রাজা ভাস্করবর্মার সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করে গৌড়রাজ শশাঙ্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। অনুমান করা হয় শশাঙ্ক যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন স্বাধীন ছিলেন। তিনি মারা গেলে হর্ষ মগধ ও ভাস্করবর্মা কঙ্গোদ জয় করেন। হর্ষ এক বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন। তিনি বলভীর

রাজা ধ্রুবসেনকে পরাজিত করেন এবং নিজ কন্যা প্রভাবতীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে দেন। হর্ষের দক্ষিণ ভারত জয়ের পরিকল্পনা চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর পরাক্রমে ব্যর্থ হয়ে যায়। হর্ষ নর্মদা নদীর দক্ষিণ তীরে প্রভাব বিস্তারে ব্যর্থ হন। মৌর্য ও গুপ্ত-বংশের নেতৃত্বে মগধের অধীনে যে সারা ভারতব্যাপী সাম্রাজ্য বিস্তার করা হয়েছিল হর্ষের সময় তার পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়নি। হর্ষকে 'সকল উত্তরাপথনাথ' রূপে বর্ণনা করা হয়। কিন্তু সারা উত্তর ভারতে তাঁর প্রভাব ছিল কিনা সে বিষয়ে কোন কোন ঐতিহাসিক সন্দেহ করে থাকেন। তাঁদের মতে কাশ্মীর, পশ্চিম পাঞ্জাব, সিন্ধু, গুজরাট, রাজপুতানা, নেপাল ও কামরূপ হর্ষের আমলে স্বাধীন ছিল।

হর্ষ সুশাসক ছিলেন। চীন সম্রাটের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। তাঁর আমলে সাহিত্যের উন্নতি হয়। তিনি স্বয়ং 'রত্নাবলী', 'প্রিয়দর্শিকা' ও 'নাগানন্দ' নামে তিনটি নাটক লেখেন। তাঁর সভাকবি বাণভট্ট 'কাদম্বরী' ও 'হর্ষচরিত' রচনা করেন।

হর্ষ প্রথমে ছিলেন শৈব, পরে হন বৌদ্ধ। তিনি সম্রাট অশোকের মত দাতব্য-চিকিৎসালয়, বিশ্রামাগার প্রভৃতি জনহিতকর কাজ করেছিলেন। প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর প্রয়াগের সঙ্গমে যে মেলা বসত, মেলার শেষে তিনি বহু দান-ধ্যান করতেন।

হিউয়েন-সাঙের আগমন: চীনের তাং রাজাদের ইতিহাস আলোচনার সময় তোমরা চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন-সাঙের এদেশে আগমনের কথা জেনেছ। হিউয়েন-সাঙ্, কেন, কিভাবে কোন পথে এদেশে আসেন, কত বছর এদেশে ছিলেন, কোন্ রাজ্যে গিয়েছিলেন—সে সম্বন্ধে তোমাদের নতুন করে বলার দরকার নেই। তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে যে তিনি চোদ্দ বছর এদেশে ছিলেন, তার মধ্যে আট বছর ছিলেন হর্ষের রাজ্যে। তিনি নেপাল থেকে কাঞ্চী, গান্ধার থেকে বাংলা কোন দেশ বাদ দেন নি। তিনি হর্ষের সমসাময়িক চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশী, পল্লবরাজ নরসিংহবর্মনের দরবারে, মালব ও বলভী গিয়ে সমাদর পেয়েছিলেন।

হিউয়েন-সাঙের বিবরণ ঃ হিউয়েন-সাঙ্ তাঁর ভারত ভ্রমণ সম্বন্ধে যে বিবরণ লেখেন তা থেকে সেই সময়কার ভারত সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান তথ্য জানা যায়। তাঁর লেখা থেকে জানা যায় ঐ সময় পাটলীপুত্র, শ্রাবস্তী, বৈশালী ও কপিলাবস্তু নগরী ধ্বংস হয়ে যায়। কনৌজ, প্রয়াগ, নালন্দা, মথুরা, থানেশ্বর, ময়ুর, বারাণসী, তাম্রলিপ্ত, পুণ্ড্রবর্ধন প্রভৃতি শহরের অস্তিত্ব ছিল।

হিউয়েন-সাঙ্ লিখেছেন যে হর্ষের রাজধানী কনৌজ বা কান্যকুব্জ ছিল উত্তর ভারতের শ্রেষ্ঠ নগর। চারিদিকে প্রাচীর ও পরিখা দিয়ে ঘেরা, লম্বায় পাঁচ মাইল, চওড়া সওয়া এক মাইল। বিদেশ থেকে বহু পণ্য এখানে আমদানি করা হত।

তিনি ভারতীয়দের জীবনযাত্রা সহজ, সরল ও অনাড়ম্বর ছিল বলে লিখেছেন। একমাত্র ধনী ব্যক্তিরা দামী পোশাক বা গহনা পরতেন।

হিন্দু সমাজে বর্ণভেদ প্রথার প্রচলন ছিল। ব্রাহ্মণগণ ধর্মকর্মে, ক্ষত্রিয়গণ শাসনকার্যে, বৈশ্যগণ ব্যবসা-বাণিজ্যে এবং শূদ্রগণ কৃষি ও অন্যান্য কাজে ব্যস্ত থাকতেন।

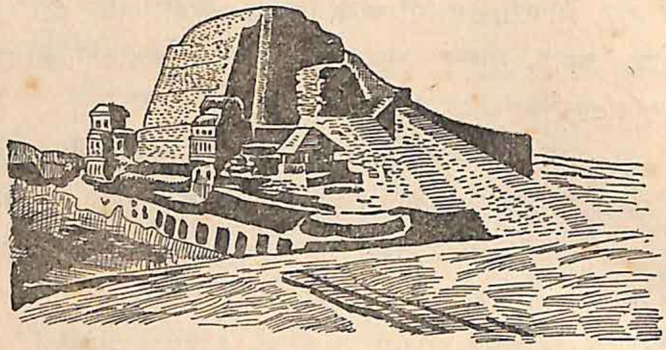
সেকালে অসবর্ণ বিবাহ নিন্দনীয় ছিল, বিধবা-বিবাহের প্রচলন ছিল না, সতীদাহ প্রথার প্রচলন ছিল। উচ্চ শ্রেণীর মহিলাদের মধ্যে পর্দা-প্রথার প্রচলন ছিল না।

সমাজে অস্পৃশ্যতার প্রচলন ছিল। কসাই, জেলে, নট-নটী, ঘাতক, মেথর ছিল অস্পৃশ্য। গ্রাম ও শহরের বাহিরে ছিল তাদের আস্তানা।

নালন্দা ঃ হিউয়েন-সাঙের বিবরণীর মধ্যে নালন্দার বিবরণ সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। হর্ষবর্ধন নালন্দার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি নালন্দার জন্য বহু অর্থ ব্যয় করতেন। অন্যান্য রাজারাও অর্থসাহায্য করতেন। প্রায় একশ গ্রামের রাজস্ব নালন্দায় ব্যয় করা হত।

সে যুগে শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে নালন্দার ছিল জগৎজোড়া খ্যাতি। ভারত ও ভারতের বাইরে মধ্য এশিয়া, চীন, কোরিয়া,

জাপান, তিব্বত থেকে প্রায় দশ হাজার ছাত্র নালন্দায় পড়াশোনা করতেন। এখানে ছাত্র ও অধ্যাপক সকলকেই থাকতে হত। ছাত্রদের ভিক্ষুর সংযম ও নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে চলতে হত।



নালন্দার ধ্বংসাবশেষ

নালন্দায় বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্র, ব্যাকরণ, ন্যায়, আয়ুর্বেদ, গণিত প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হত। শিক্ষার মান ছিল যথেষ্ট উঁচু। বাঙালী পণ্ডিত শীলভদ্র নালন্দার অধ্যক্ষ ছিলেন। হিউয়েন-সাঙ্ তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হর্ষোত্তর যুগের ইতিহাস

হর্ষবর্ধন বাহুবলে রাজ্য জয় করে উত্তর ভারতে রাজনৈতিক ঐক্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর পুনরায় উত্তর ভারতের রাজনৈতিক ঐক্য বিনষ্ট হয়ে যায়। হর্ষের মৃত্যুর পর সপ্তম শতকে উত্তর ভারতে ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্রের বদলে ছোট ছোট রাজ্যের সৃষ্টি হয়। ঐ সব রাজ্যগুলির মধ্যে কাশ্মীর, কনৌজ প্রভৃতি রাজ্য উল্লেখ করার মত। কনৌজের যশোবর্মন বাংলা (গৌড়), রাজপুতানার অংশবিশেষ এবং থানেশ্বর জয় করেছিলেন। কিন্তু সারা উত্তর ভারতে এক রাজার শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

রাজপুত রাজ্যগুলির উত্থান : হর্ষোত্তর যুগের অন্যতম প্রধান ঘটনা রাজপুত জাতির অভ্যুত্থান। হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর থেকে দ্বাদশ শতকে দিল্লীর সুলতানীর সূচনাকাল পর্যন্ত রাজপুতগণ উত্তর ভারতের নানা জায়গায় শাসন করতে থাকে। ঐ সময়কে কোন কোন ঐতিহাসিক ভারতের ইতিহাসে রাজপুত যুগ হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। রাজপুতরা মুসলমান আক্রমণ থেকে দেশ রক্ষা করতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিল। রাজপুতদের পরাজয়ের পরই উত্তর ভারতে মুসলমান অধিকার শুরু হয়। প্রায় চারশ বছর ধরে রাজপুতরা ভারতের কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে রক্ষা করে। রাজপুতগণ তাদের মহত্ত্ব ও বীরত্বের জন্য বিশেষ প্রশংসার অধিকারী ছিল।

রাজপুত শাসন ছিল সামন্ততান্ত্রিক, হর্ষের মৃত্যুর পর অনেকগুলি রাজপুত রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল; ঐসব রাজপুত রাজ্যের মধ্যে গুর্জর-প্রতিহার, চৌহান, পরমার ও চৌলুক্য বা শোলাঙ্কীদের রাজ্য ছিল প্রসিদ্ধ। তাছাড়া গাহাড়বাল, চন্দেল্ল প্রভৃতি আরও অনেক রাজ্য ছিল।

প্রাচীনকালে পাটলীপুত্র নগরের যে গুরুত্ব ছিল, হর্ষের সময় থেকে কনৌজ নগরী সেই গুরুত্ব পায়। হর্ষের মৃত্যুর পর আর্যাবর্তে কনৌজ অধিকার করে উত্তর ভারতে আধিপত্য বিস্তারের জন্য যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়, তাতে গুর্জর-প্রতিহার বংশ সাফল্য লাভ করে। প্রতিহারগণ কনৌজ অধিকারের পর সেখানে রাজধানী বদল করে। অন্যান্য রাজপুত রাজ্যগুলির রাজারা গুর্জর-প্রতিহারদের অধীনস্থ সামন্ত রাজ্য হিসেবে নিজ নিজ রাজ্যের শাসন করতে থাকেন। উত্তর ভারতে রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয় না।

পাল, প্রতিহার ও রাষ্ট্রকূটদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা : প্রতিহারদের সঙ্গে বাংলার পাল ও দক্ষিণ ভারতের রাষ্ট্রকূটদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হর্ষের পরবর্তীকালের ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। প্রতিহাররাজ বৎসরাজ বাংলার রাজা ধর্মপালকে পরাজিত করেন কিন্তু তিনি স্বয়ং রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুবের কাছে পরাজিত হন। ঐ সুযোগে ধর্মপাল

মগধ ও বারাণসী জয় করেন কিন্তু তিনিও ধ্রুবের কাছে পরাজিত হন। ধ্রুবের প্রত্যাবর্তনের পর ধর্মপাল কনৌজ অধিকার করে চক্রায়ুধকে সিংহাসনে বসান। কিন্তু বৎসরাজের পুত্র প্রতিহাররাজ দ্বিতীয় নাগভট্ট চক্রায়ুধ ও ধর্মপালকে পরাজিত করেন। কিন্তু তিনিও রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দর কাছে পরাজিত হন। ধর্মপাল ও চক্রায়ুধ তৃতীয় গোবিন্দর কাছে নতি স্বীকার করেন। ৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় ইন্দ্র কনৌজ অধিকার ও লুণ্ঠন করে প্রতিহার রাজ্যের ওপর প্রবল আঘাত করেছিলেন।

হর্ষের মৃত্যুর পর সারা উত্তর ভারতে প্রতিহার, পাল বা রাষ্ট্রকূট—কোন বংশ নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে পারে নি। কোন কোন সময়ে প্রতিহার বংশের রাজারা আবার কোন সময়ে পাল বংশের ধর্মপাল ও দেবপাল উত্তর ভারতের কিছু কিছু অংশে রাজ্য বিস্তার করেছিলেন। দেবপালের সময়ে পাল রাজ্য ব্রহ্মপুত্র থেকে সিন্ধুনদ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পালশাসনের চারশ বছরে রাজ্যের সীমা এক ছিল না। কিন্তু উত্তর ভারতের পূর্ণ ঐক্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয় নি। সারা দেশ জুড়ে ছিল ছোট ছোট রাজ্য। ঐ সব রাজ্যের রাজারা ছিলেন প্রতিহার বা পাল রাজাদের সামন্ত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বাংলার ইতিহাস

শশাঙ্ক: খ্রীস্টীয় ষষ্ঠ শতকে হূণ আক্রমণ, আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা প্রভৃতি কারণে গুপ্ত বংশের শাসনের ভিত্তি শিথিল হয়ে পড়ে। বিভিন্ন প্রদেশের শাসনকর্তাদের মত বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের শাসকেরাও ঐ সুযোগে স্বাধীন হয়ে যান। কিন্তু প্রথম স্বাধীন সার্বভৌম বাঙালী রাজা ছিলেন শশাঙ্ক। তিনি ছিলেন হর্ষবর্ধনের সমসাময়িক ও প্রতিদ্বন্দ্বী। মুর্শিদাবাদ জেলার রাঙামাটি অঞ্চলে

কর্ণসুবর্ণ ছিল তাঁর রাজধানী। তিনি মেদিনীপুর, উৎকল, কঙ্গোদ ও মগধ জয় করে মৌখরীদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হন। শশাঙ্কের মিত্র ছিলেন মালবরাজ দেবগুপ্ত আর বিপক্ষে ছিলেন কামরূপরাজ ভাস্করবর্মা, কনৌজের মৌখরী-গ্রহবর্মা ও থানেশ্বরের পুষ্যভূতি রাজ্যবর্ধন ও হর্ষবর্ধন। শশাঙ্ক হর্ষবর্ধন ও ভাস্করবর্মার আক্রমণ প্রতিহত করেন। তিনি মারা যাবার পর তাঁর রাজ্য হর্ষবর্ধন ও ভাস্করবর্মা অধিকার করেছিলেন।

পাল ও সেন যুগে জীবনযাত্রা ও সমাজঃ প্রথমে তোমাদের পাল ও সেন বংশের ইতিহাস বলছি। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর বাংলায় একশ বছর ধরে চলে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা বা 'মৎস্যন্যায়'। ঐ অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য দেশের প্রধানরা গোপাল নামে একজনকে রাজা নির্বাচন করে। বাংলায় পাল বংশের শাসন শুরু হয়। পাল বংশের রাজারা প্রায় চারশ বছর রাজত্ব করেন। গোপালের পুত্র ধর্মপালের আমলে পাল-প্রতিহার ও রাষ্ট্রকূটদের সংগ্রামের কথা তোমরা আগেই জেনেছ। ধর্মপালের পুত্র দেবপাল আসাম ও উড়িষ্যা জয় করেন। তিনি হূণ, গুর্জর, রাষ্ট্রকূটদের পরাজিত করেন। দেবপালের পর পালবংশের দুর্বলতা শুরু হয়ে যায়। দ্বাদশ শতকে পালবংশের শাসনের অবসানের পর সেন বংশের শাসন শুরু হয়। সেনরাজ বল্লাল সেন কৌলীন্য প্রথা প্রবর্তন করে খ্যাতি লাভ করেন। তাঁর পুত্র লক্ষ্মণ সেনের রাজ্য উত্তরে গৌড়, পূর্বে কামরূপ, দক্ষিণে উড়িষ্যা ও পশ্চিমে মগধ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ১২০২ খ্রীষ্টাব্দে বখতিয়ার খলজীর নেতৃত্বে তুর্কীরা নদীয়া তথা পশ্চিম বাংলা অধিকার করে। লক্ষ্মণ সেন ও তাঁর বংশধরগণ বাংলার বাকী অংশে আরও পঞ্চাশ বছর রাজত্ব করেন। তারপর বাংলায় মুসলমান শাসন শুরু হয়।

এখন তোমাদের পাল ও সেন যুগের বাংলার মানুষের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে বলছি। ঐ সময়ে মানুষের তেমন একটা অভাব ছিল না। বার মাসে তের পার্বণ লেগে থাকত। তাছাড়া

অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বিবাহ, শ্রাদ্ধ উপলক্ষে ঘরে ঘরে ক্রিয়াকর্ম ও উৎসব লেগে থাকত। নাচ-গান-বাজনা, সাজ-সজ্জা, খাওয়া-দাওয়া নানারকম আমোদ-আহ্লাদ লেগে থাকত। শিকার, পশু-পাখীর লড়াই, কুস্তি, পাশা, দাবা, কড়ি ও ঘুঁটির খেলা ছিল অবসর কাটানোর উপকরণ। সাধারণ লোকে নৌকা ও গোরুর গাড়ী চেপে আর ধনীরা ঘোড়া বা ঘোড়ার গাড়ী চেপে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়া-আসা করত। ঐ সময়ে বাঙালীর প্রধান খাদ্য ছিল ভাত, মাছ-মাংস, শাক-সবজি, ফল-মূল, দুধ ও দুধের তৈরী খাবার, মদ্যপানও চলত।

পুরুষরা ধুতি আর মেয়েরা শাড়ী পরত। মেয়েরা কাঁচুলি ও ওড়না আর পুরুষরা চাদর গায়ে দিত। মেয়ে-পুরুষ নির্বিশেষে হার, আংটি, হাতের গহনা পরত, বিবাহিতা মেয়েরা মাথায় সিঁদুর, কপালে টিপ, পায়ে আলতা লাগাত। মাথার চুল পরিপাটি করে আঁচড়ানো হত। মেয়েরা নানা রকম চুল বাঁধত।

গুপ্ত যুগে বাংলার সমাজে যে বর্ণভেদ ছিল পাল রাজারা বৌদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও সেই বর্ণভেদ প্রথা বজায় ছিল। কিন্তু বর্ণাশ্রম প্রথা কিছুটা শিথিল হয়ে পড়ে। সেন রাজারা ছিলেন হিন্দু। সেন রাজ বল্লালসেন বর্ণাশ্রম প্রথা কঠোরভাবে প্রয়োগ করতে গিয়ে সমাজে কৌলীন্য-প্রথার প্রবর্তন করেছিলেন। কিন্তু ঐ প্রথার অপব্যবহারের ফলে নানারকম কুফল দেখা দেয়। সেন যুগে স্পৃশ্য, অস্পৃশ্য, প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতির প্রচলন ছিল।

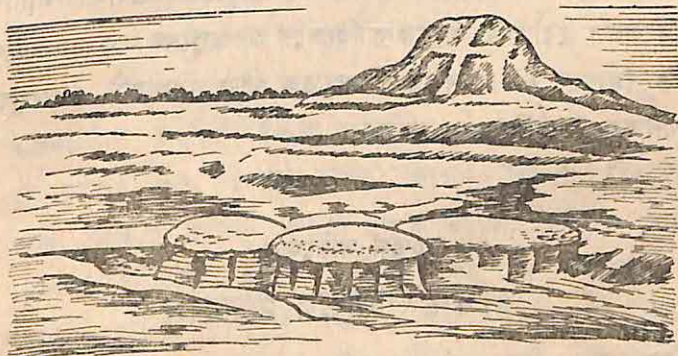
পাল ও সেন আমলে বাংলায় পুরুষরা একাধিকবার বিবাহ করতে পারত। মেয়েরা ছিল পুরুষদের অধীন। তবে মেয়েদের অবরোধ প্রথার প্রচলন ছিল না। মেয়েরা লেখাপড়াও করতে পারত। বিধবাদের কঠোর সংযম পালন করতে হত। সহমরণ প্রথারও অস্তিত্ব ছিল।

সমাজে চাষী, কামার, কুমোর, ছুতোর, তাঁতী—নানা বৃত্তির লোক ছিল। ঐ সময় সামন্তপ্রথা ভালোভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সমাজে চাষীদের গুরুত্ব যথেষ্ট বেড়ে যায়।

ধর্ম ও শিক্ষাঃ পাল রাজারা ছিলেন ধর্মে বৌদ্ধ, কিন্তু পরধর্মসহিষ্ণু। পালযুগে মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের পাশে তান্ত্রিক সহজিয়া বৌদ্ধ ধর্মেরও প্রচলন ছিল। সহজিয়া বৌদ্ধ সাধুরা বৌদ্ধ ধর্মকে সহজ করে অশিক্ষিত লোকের মধ্যে প্রচার করতেন। তারা যে সব গান বাঁধতেন—সেগুলিকে বলা হয় চর্যাপদ। চর্যাপদ হচ্ছে—বাংলা ভাষার প্রথম সাহিত্য।

সেন রাজারা ছিলেন হিন্দু, শৈব, বৈষ্ণব ধর্ম ও সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের অনুরাগী। সেনরাজ বল্লালসেন হিন্দুদের আচার অনুষ্ঠান নিয়ে পাঁচটি বই লিখেছিলেন—তার রচিত দানসাগর ও অদ্ভুতসাগর নামে বই দুটি পাওয়া গেছে। লক্ষ্মণ সেনের সভাসদ হলায়ুধ 'ব্রাহ্মণ সর্বস্ব' নামে এক ধর্মগ্রন্থ লেখেন, যাতে বেদের মন্ত্র ও অনুষ্ঠানের ব্যাখ্যা আছে। লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি জয়দেব গীতগোবিন্দ গীতিকাব্যে রাধা-কৃষ্ণের লীলার সুন্দর বর্ণনা করেছেন।

পাল ও সেন যুগে শিক্ষা অব্যাহত ছিল। পাল যুগে শিক্ষা কেন্দ্ররূপে নালন্দা পূর্ব গৌরবের আসনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পাল



পাহাড়পুর (সোমপুর)-এর ধ্বংসাবশেষ

রাজারা নালন্দার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। নালন্দা ছাড়াও পাল যুগে অনেকগুলি শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। ঐ যুগের বিহারগুলির মধ্যে ত্রৈপুটক, বাংলার রাজশাহীতে সোমপুর (পাহাড়পুর),

বিক্রমশীলা মহাবিহার ও ওদন্তপুর বিহার ছিল বিখ্যাত। তোমাদের এখন বিক্রমশীলা ও ওদন্তপুর বা উদন্তপুর বিহারের কথা বলছি।

পালরাজ ধর্মপাল (এখনকার ভাগলপুরের কাছে) বিখ্যাত বিক্রমশীলা মহাবিহার প্রতিষ্ঠা করেন। এটি ছিল একটি অবৈতনিক শিক্ষাকেন্দ্র। ভারতের নানা প্রান্ত থেকে এমনকি ভারতের বাইরের নানা দেশ থেকে শিক্ষার্থীরা পড়াশোনার জন্য এখানে আসতেন।

বিক্রমশীলার এক আচার্য ছিলেন বুদ্ধ জ্ঞানপাদ। বিখ্যাত পণ্ডিত অতীশ বা দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানও এক সময়ে এখানে অধ্যাপনা করতেন। এখানে মোট ১১৪ জন অধ্যাপক অধ্যাপনা করতেন। বিক্রমশীলা ছিল মহাযান ধর্মের পীঠস্থান।

ওদন্তপুর বা উদন্তপুর বিহারটি এখানকার বিহার শরীফের কাছে অবস্থিত ছিল। সম্ভবতঃ পালরাজ গোপাল ঐ বিহারের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ওদন্তপুরের বিখ্যাত আচার্য ছিলেন শীলরক্ষিত। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত অতীশ বা দীপঙ্কর তাঁর কাছে দীক্ষালাভের পর ঐ নামে পরিচিত হন। তার আগে তাঁর নাম ছিল চন্দ্রগর্ভ। তিনি এক সময় ওদন্তপুরের প্রধান আচার্যও হয়েছিলেন। বৌদ্ধধর্ম শিল্পকেন্দ্র হিসেবে ওদন্তপুরের এক সময় যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। সম-য়ে নামে তিব্বতের শ্রেষ্ঠ বিহারটি ওদন্তপুরের আদর্শে গড়ে উঠেছিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

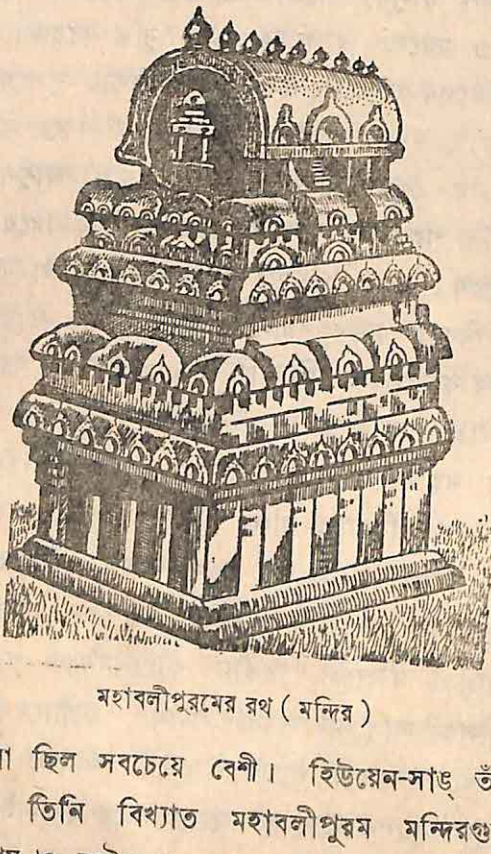
দক্ষিণ ভারতের ইতিহাস

পূর্বকথাঃ বিন্ধ্য পর্বতের দক্ষিণের ভূ-খণ্ডকে দক্ষিণাপথ আর কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণের ভূ-খণ্ডকে সুদূর দক্ষিণ বলা হয়। রামায়ণের যুগের পূর্বে এখানে আর্য সভ্যতার প্রসার হয়নি। পরে আর্য ও দ্রাবিড় সভ্যতার সমন্বয়ে এক উন্নত সভ্যতা গড়ে ওঠে। মৌর্য চন্দ্রগুপ্ত ও অশোকের আমলে দক্ষিণ ভারতে মৌর্য শাসন

প্রসার লাভ করে। গুপ্ত সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের শাসকদের কাছ থেকে আনুগত্য আদায় করেন। মৌর্য যুগের পর দক্ষিণ ভারতে চেতবংশীয় খারবেল ও সাতবাহন রাজগণ শক্তিশালী রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। গুপ্ত যুগের পর দক্ষিণ ভারতে কয়েকটি শক্তিশালী রাজ্য গড়ে উঠেছিল তার মধ্যে রাষ্ট্রকূট রাজদের উল্লেখ তোমরা ইতিমধ্যেই দেখতে পেয়েছ। অপর কয়েকটি রাজ্য সম্বন্ধে এখন তোমাদের বলছি।

বাদামির চালুক্য বংশঃ বাদামি বা বাতাপিকে কেন্দ্র করে প্রথম পুলকেশী চালুক্য রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। তারপর প্রথম কীর্তিবর্মন ও মঙ্গলেশ রাজ্যটির শক্তি বৃদ্ধি করেন। এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন হর্ষবর্ধনের সমসাময়িক দ্বিতীয় পুলকেশী। তিনি দক্ষিণ গুজরাট, মালব, কোঙ্কন ও কর্ণাটক পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন। চোল, কেরল ও পাণ্ড্য রাজ্য তাঁর আনুগত্য স্বীকার করে। তিনি পল্লবরাজ মহেন্দ্রবর্মনকে হারিয়ে দিয়ে কাঞ্চীনগর অধিকার করেন। তাঁর প্রতাপে হর্ষের পক্ষে নর্মদা নদীর দক্ষিণে আধিপত্য বিস্তার সম্ভব হয়নি। হিউয়েন সাঙ্ তাঁর ঐশ্বর্য ও শক্তির উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তিনি ৬৪২ খ্রীস্টাব্দে পল্লব নরসিংহ-বর্মনের কাছে পরাজিত ও নিহত হন। তাঁর পুত্র প্রথম বিক্রমাদিত্য নরসিংহবর্মনকে পরাজিত করে কাঞ্চী দখল করেন। এই বংশের শেষ বিখ্যাত রাজা ছিলেন দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য। তিনি পল্লব রাজধানী কাঞ্চী দখল করেন, সিন্ধুর আরবদের আক্রমণ প্রতিহত করেন। তিনি বিরূপাক্ষ মন্দিরটি নির্মাণ করান। রাষ্ট্রকূট দন্তিদুর্গ দ্বিতীয় কীর্তিবর্মনকে পরাজিত করে বাদামির চালুক্য শাসনের অবসান ঘটান। কল্যাণে চালুক্য বংশের একটি শাখা রাজত্ব করতে থাকে। তাদের আমলে বহু বৌদ্ধ মঠ ছিল। চালুক্য শাসনকালে পাহাড়ের গায়ে খোদাই করে গুহা-মন্দির নির্মাণের পদ্ধতির প্রচলন হয়। অজন্তা গুহা-চিত্রের কয়েকটি চালুক্য আমলে আঁকা হয়েছিল বলে একদল পণ্ডিত মনে করেন।

কাঞ্চীর পল্লব বংশঃ সাতবাহন বংশের পর পল্লবগণ দক্ষিণ ভারতে একটি শক্তিশালী রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। এই রাজ্যের রাজা বিষ্ণুগোপ সমুদ্রগুপ্তের কাছে অধীনতা স্বীকার করেন। ষষ্ঠ-শতকে এই বংশের শক্তিশালী রাজা ছিলেন সিংহবিষ্ণু। তিনি চোর, চোল, পাণ্ড্য ও সিংহল পর্যন্ত আধিপত্য বিস্তার করেন। সপ্তম শতকে মহেন্দ্রবর্মন চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর কাছে হার স্বীকার করেন। কিন্তু তাঁর পুত্র নরসিংহবর্মন পুলকেশীকে পরাজিত ও নিহত করিয়া বাতাপি অধিকার করেন। তাঁর আমলে পল্লব



মহাবলীপুরমের রথ (মন্দির)

রাজ্যের সীমা ছিল সবচেয়ে বেশী। হিউয়েন-সাং তাঁর রাজ্যে এসেছিলেন। তিনি বিখ্যাত মহাবলীপুরম মন্দিরগুলি নির্মাণ করান। সপ্তম ও অষ্টম শতকে চালুক্যদের পুনঃপুনঃ আক্রমণ ও আত্মকলহে পল্লবগণ দুর্বল হয়ে পড়েন। রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দও

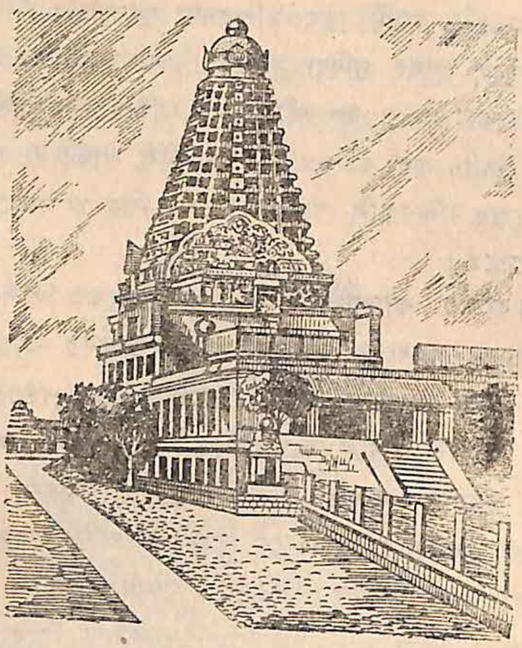
পল্লবরাজ দন্তিবর্মনকে পরাজিত করেন, চোলবংশীয় আদিত্য পল্লবরাজ অপরাজিতকে পরাজিত করে পল্লব শাসনের অবসান ঘটান।

পল্লবগণ শিল্প ও স্থাপত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। প্রথম মহেন্দ্রবর্মন ত্রিচিনাপল্লীতে বহু সুন্দর সুন্দর মন্দির নির্মাণ করেন। পল্লব রাজধানী কাঞ্চী ছিল মন্দিরময়, স্থাপত্যের নিদর্শনে ভরা। পল্লব আমলে পাথর খুদিয়া মন্দির নির্মাণের রীতির প্রচলন হয়। নরসিংহবর্মনের সময়ে মহাবলীপুরমের মন্দির ও সমুদ্রতীরে বিখ্যাত 'সপ্তরথ' নির্মাণ করা হয়। ঐ মন্দিরগুলি, কাঞ্চী ও পল্লব রাজ্যের নানা প্রান্তের মন্দিরগুলি পল্লব আমলের শিল্প ও স্থাপত্যের উন্নতির সাক্ষ্য দিতেছে।

চোল বংশ ঃ কাত্যায়নের লেখা ও অশোকের লিপিতে চোলদের উল্লেখ আছে, পল্লবদের উত্থানে তারা পল্লবদের কাছে স্বাধীনতা হারায়। কিন্তু পল্লবদের দুর্বলতার সুযোগে নবম শতকের মধ্যভাগে চোলগণ আবার স্বাধীন হয়ে পড়ে। চোলরাজ আদিত্য পল্লব শাসনের অবসান ঘটান। প্রথম পরন্তকের আমলে রাষ্ট্রকূট ও চালুক্যদের একযোগে আক্রমণে চোলদের শক্তি কিছুদিনের জন্য হ্রাস পায়। দশম শতকের শেষভাগে প্রথম রাজরাজ চোল বংশের লুপ্ত মর্যাদা পুনরুদ্ধার করেন। তিনি চের, পাণ্ড্য, সিংহলের উত্তরাংশ, কর্ণাটকের অংশবিশেষ এবং সম্ভবতঃ কলিঙ্গ জয় করেন। তিনি ছিলেন শৈব, তাঁর আমলে তাঞ্জোরের বিখ্যাত রাজরাজেশ্বর মন্দিরটি নির্মাণ করা হয়। তিনি নেগাপত্তমে বৌদ্ধ মন্দির নির্মাণের অনুমতি দেন। তাঁর পুত্র রাজেন্দ্র চোল ছিলেন চোল বংশের সবচেয়ে শক্তিশালী শাসক। তিনি কল্যাণের চালুক্যরাজ, গঙ্গারাজ ও বাংলার মহীপালকে পরাজিত করেন। তিনি গঙ্গার তটভূমি জয় স্মরণীয় করে রাখার জন্য গঙ্গাইকোণ্ডা উপাধি নেন। তিনি পুরনো রাজধানী তাঞ্জোরের বদলে নতুন রাজধানী করেন গঙ্গাইকোণ্ডচোলপুরম। রাজেন্দ্র চোলদেবের পর চোল ও চালুক্যদের সংগ্রামে চোল রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়ে। ১৩১০ খ্রীস্টাব্দে দিল্লীর সুলতানের সেনাপতি

মালিক কাফুর চোল রাজ্য জয় করায় চোল রাজ্যের স্বাধীন অস্তিত্ব থাকে না।

চোল রাজগণের শক্তিশালী নৌ-বাহিনী ছিল। নৌ-বাহিনীর সাহায্যে চোলরাজগণ ভারতের বাহিরে বহু দেশ জয় করেন।



রাজরাজেশ্বর মন্দির

রাজরাজ নৌ-বাহিনীর সাহায্যে সিংহলের উত্তরাংশ জয় করেন। তাঁর পুত্র রাজেন্দ্র চোল নৌ-বাহিনীর সাহায্যে আন্দামান, নিকোবর, ব্রহ্মের পেগু, মালয়, সুমাত্রা ও যবদ্বীপে আধিপত্য বিস্তার করেন। রাজেন্দ্র চোল ছাড়া অন্য কোন ভারতীয় রাজার পক্ষে জলপথে এত দূরদেশে আধিপত্য বিস্তার করা সম্ভব হয়নি।

অনুশীলনী

(ক) ১। ভারতে হূণ আক্রমণ সম্বন্ধে যা জান লেখ।

২। গুপ্ত সাম্রাজ্যের ভাঙ্গন ও স্বাধীন রাজ্যগুলির প্রতিষ্ঠার কথা লেখ।

৩। হর্ষবর্ধন সম্বন্ধে যা জান লেখ।

৪। হিউয়েন-সাঙের বিবরণ সম্বন্ধে আলোচনা কর।
৫। রাজপুত রাজ্যগুলির উত্থানের ইতিহাস লেখ।
৬। পাল, রাষ্ট্রকূট ও প্রতিহারদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা সম্বন্ধে আলোচনা কর।
৭। শশাঙ্ক কে ছিলেন? তাঁর সম্বন্ধে যা জান লেখ।
৮। পাল ও সেন বংশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লেখ।
৯। পাল ও সেন যুগের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে আলোচনা কর।
১০। পাল ও সেনযুগের সমাজ চিত্র দাও।
১১। পাল ও সেনযুগের ধর্ম ও শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা কর।
১২। বাদামির চালুক্যদের ইতিহাস লেখ।
১৩। কাঞ্চীর পল্লবদের ইতিহাস লেখ।
১৪। চোল বংশের ইতিহাস লেখ।

(খ) **সংক্ষেপে উত্তর দাও ঃ**

১। হূণ আক্রমণের কি প্রভাব ছিল?
২। নালন্দা সম্বন্ধে কি জান?
৩। ওদন্তপুর বা বিক্রমশীলার যে কোন একটি সম্পর্কে আলোচনা কর।
৪। পল্লব শিল্প সম্বন্ধে আলোচনা কর।
৫। চোল রাজদের নৌ-শক্তির উল্লেখ কর।

(গ) **মৌখিক প্রশ্নাবলী ঃ**

১। 'শ্বেত হূণ' কারা?
২। হর্ষবর্ধনের লেখা তিনটি বইএর নাম কি?
৩। 'হর্ষচরিত' কে লিখেছিলেন?
৪। তৃতীয় ইন্দ্র কত খ্রীস্টাব্দে কনৌজ অধিকার ও লুণ্ঠন করেন?
৫। শশাঙ্কের রাজধানীর নাম কি?
৬। 'মৎস্যন্যায়' কোন সময়কে বলা হয়?
৭। কে পাল বংশের শাসনের সূত্রপাত করেন?
৮। বিক্রমশীলা ও ওদন্তপুর বিহারের একজন করে আচার্যের নাম বল।
৯। চালুক্যবংশের সবচেয়ে শক্তিশালী রাজা কে ছিলেন?
১০। মহাবলীপুরমের মন্দির কার আমলে নির্মিত হয়?
১১। 'গঙ্গাইকোণ্ডা' উপাধি কে নিয়েছিলেন?
১২। 'রাজরাজেশ্বর' মন্দির কোথায়?

দ্বাদশ অধ্যায়

বিদেশের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ

প্রাচীনকাল থেকে ভারতের সঙ্গে ভারতের বাইরের বিভিন্ন দেশের যোগাযোগ ছিল। প্রধানতঃ বাণিজ্যকে কেন্দ্র করেই ঐ যোগাযোগ গড়ে ওঠে। পরে সাংস্কৃতিক সম্পর্কও গড়ে ওঠে। ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি ভারতের বাইরে বিভিন্ন দেশে প্রচার লাভ করে।

নব্য প্রস্তর যুগ থেকেই ভারতীয়রা এশিয়ার নানা দেশের লোকজনের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছিল। সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতার যুগে মহেঞ্জোদরো এবং হরপ্পার অধিবাসীদের সঙ্গে মিশর, সিরিয়া, মেসোপটেমিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। সুমেরের আকাদে ভারতীয় বণিকদের একটি উপনিবেশ ছিল। ব্যাবিলনের সঙ্গে জলপথে যাতায়াত ছিল বলে একদল পণ্ডিতের ধারণা। মৌর্য সম্রাট অশোক বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য সিরিয়া, পশ্চিম এশিয়ার ও উত্তর আফ্রিকার গ্রীক-শাসিত রাজ্যগুলিতে ধর্মপ্রচারক পাঠিয়েছিলেন। কুষাণ যুগে ভারতীয় বণিকরা রোম পর্যন্ত গিয়েছিল।

মধ্য এশিয়ার সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ: এক সময় ভারতের সঙ্গে স্থলপথে মধ্য এশিয়ার খোটান, কুচাউ, তুরফান প্রভৃতি অঞ্চলের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। ঐ সব স্থানে ভারতীয় সভ্যতা বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল। বাণিজ্য ছাড়া মহাযান বৌদ্ধধর্মকে কেন্দ্র করে মধ্য এশিয়ার সঙ্গে ভারতের সাংস্কৃতিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। স্যার অরেল স্টাইন নামে এক প্রত্নতাত্ত্বিক মধ্য এশিয়ার নানা স্থানে কঠোর পরিশ্রম করে মাটির নীচে থেকে ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির বহু নিদর্শন আবিষ্কার করেন। বৌদ্ধ মঠ, স্তূপ, বুদ্ধ ও হিন্দু দেবদেবীর অনেক মূর্তি সেখানে পাওয়া গেছে। হিন্দু দেব-দেবীর মূর্তির মধ্যে কুবের ও গণেশের মূর্তি উল্লেখযোগ্য। ধ্বংসাবশেষ থেকে সংস্কৃত, প্রাকৃত ভাষায় বহু হাতে লেখা পুঁথিও

পাওয়া গেছে। চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন-সাঙ্-এর লেখা থেকে জানা যায় যে, ভারতে আসার পথে মধ্য এশিয়ার খোটানের আশেপাশে অন্ততঃ একশটি বৌদ্ধবিহার ও পাঁচ হাজার বৌদ্ধ ভিক্ষু দেখেছিলেন। খোটানের চারপাশে বৌদ্ধধর্ম ও বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে কুষাণ আমলে বহু ভারতীয় উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল।

চীনের সঙ্গে যোগাযোগঃ মধ্য এশিয়ার খোটান অঞ্চল থেকে চীনদেশে বৌদ্ধধর্ম তথা ভারতীয় সভ্যতা বিস্তার লাভ করে। বৌদ্ধ-ধর্মকে কেন্দ্র করে চীন ও ভারতের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। বিভিন্ন সময়ে বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ করা এবং বৌদ্ধ-ধর্মের তীর্থস্থানগুলি পরিদর্শনের জন্য বহু চীনা পরিব্রাজক ভারতে আসেন। ঐ উদ্দেশ্যে গুপ্তযুগে এদেশে আসেন ফাহিয়েন, হর্ষের আমলে হিউয়েন-সাঙ্ এবং পরে ইৎ-সিং। ভারতবর্ষ থেকে চীনে যান গোহরণ, কাশ্যপমাতঙ্গ, ধর্মরক্ষিত। ভারতীয় ভাষায় লেখা অনেক বই চীনা ভাষায় অনূদিত হয়। চীনদেশের স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে ভারতীয় শিল্পরীতির প্রভাব দেখা যায়। বৌদ্ধধর্ম ছাড়াও বাণিজ্য ও রাজনৈতিক কারণে চীনের সঙ্গে ভারতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। চীন থেকে কোরিয়া ও জাপানে ভারতের সভ্যতা সংস্কৃতি ও বৌদ্ধধর্ম প্রসার লাভ করে।

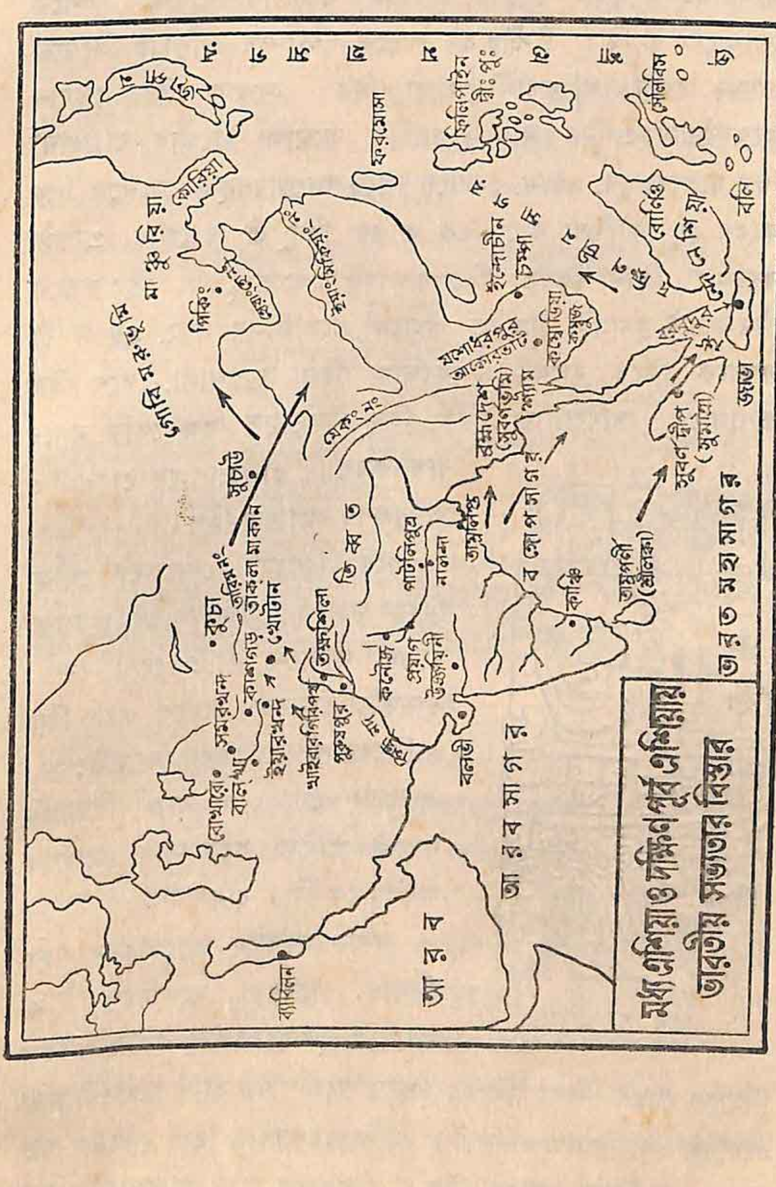
ভারত ও তিব্বতঃ বৌদ্ধধর্মকে কেন্দ্র করে তিব্বতের সঙ্গে ভারতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে, হর্ষবর্ধনের সময়ে তিব্বতের রাজা ছিলেন স্রং-সান গাম্পো। তিনি নেপালের রাজকুমারীকে বিবাহ করেন। তিনি তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম ও ভারতীয় বর্ণমালার প্রচলন করেন। প্রধানতঃ বৌদ্ধধর্মকে কেন্দ্র করে দুই দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তিব্বতের লামারা নালন্দা ও বিক্রমশীলায় এসে বৌদ্ধধর্মশাস্ত্র পড়াশোনা করতেন। বৌদ্ধধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে বহু ভারতীয় বৌদ্ধ সন্ন্যাসী তিব্বতে যান। তাঁদের মধ্যে শান্তিরক্ষিত, কমলশীল, পদ্মনাভ, অতীশ বা দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান উল্লেখযোগ্য।

ভারত-তিব্বত সম্পর্কের ক্ষেত্রে অতীশ বা দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা করা দরকার। ৯৮৩ খ্রীস্টাব্দে পূর্ব বাংলার বিক্রমপুরে তাঁর জন্ম হয়। সন্ন্যাসী হওয়ার আগে তাঁর নাম ছিল চন্দ্রগর্ভ, তিনি বিখ্যাত পণ্ডিত জেতরির কাছে শিক্ষালাভ করেন। ওদন্তপুর ও অন্যান্য বিহারে পড়াশোনার পর ১৯ বছর বয়সে ওদন্তপুর বিহারের আচার্য শীলরক্ষিতের কাছে দীক্ষা নেওয়ার পর তিনি অতীশ বা দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান নামে পরিচিত হন। তিনি সুবর্ণদ্বীপের বিখ্যাত আচার্য চন্দ্রকীর্তির কাছে বার বছর শিক্ষা-লাভ করে সিংহল (শ্রীলঙ্কা) হয়ে মগধে আসেন। তিনি বিক্রমশীলা মহাবিহারের আচার্য পদে নিযুক্ত হন। ঐ সময়ে তিব্বতের রাজা ভারতবর্ষে আচার্যের সন্ধানে দূত পাঠান। নানা রকম দামী উপহার নিয়ে দূত দীপঙ্করের কাছে আসে। দীপঙ্কর উপহারসহ দূতকে ফিরিয়ে দেন। কিন্তু মৃত্যুপথযাত্রী তিব্বতরাজের অনুরোধ ঠেলতে না পেরে নেপাল ও হিমালয়ের পথে মাত্র চারজন সঙ্গী নিয়ে তিব্বত যাত্রা করেন। তিনি তাঁর জীবনের শেষ তের বছর তিব্বতে কাটান। ১০৫৩ খ্রীস্টাব্দে তিনি দেহত্যাগ করেন। তিনি তিব্বতে বিশুদ্ধ মহাযান বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন এবং প্রচলিত ধর্মে সংস্কার করেন। তিনি প্রায় দুশোর বেশী ধর্ম বিষয়ে বই লিখেছিলেন। তিব্বতীয়রা তাঁকে দেবতা জ্ঞান করত।



অতীশ দীপঙ্কর

জলপথে নানা দেশের সঙ্গে যোগাযোগ—ভারত ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াঃ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াকে সেকালে বলা হত সুবর্ণভূমি। ভারতের বণিকরা ঐ অঞ্চলের নানা দেশে পণ্য-সামগ্রী বিক্রী করে দেশে প্রচুর সোনা নিয়ে ফিরতেন—সেজন্য সুবর্ণভূমি নাম। দক্ষিণ-



মধ্য এশিয়া ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় সভ্যতার বিস্তার

পূর্ব এশিয়ার নানা দেশের বৌদ্ধ ও শৈব রাজারা ভারতীয় ধর্ম, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির বহু নিদর্শন রেখে গেছেন। এখন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কয়েকটি দেশে ভারতীয় সভ্যতার প্রসার সম্পর্কে তোমাদের বলছি। খ্রীস্টীয় ষষ্ঠ শতকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় কম্বোজ নামে একটি শক্তিশালী রাজ্য ছিল। কম্বোজ ছিল বর্তমান কম্বোডিয়ার প্রাচীন নাম। প্রাচীন কম্বোজ রাজ্যের রাজধানী ছিল যশোধরপুর, এখন যেখানে আছে আঙ্কোরথম্। অনেকে মনে করেন যে কৌণ্ডিণ্য নামে এক ক্ষত্রিয় হিন্দু ঐ রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি সম্ভবতঃ ছিলেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত। তের শতকে চীন সম্রাট কুবলাই খাঁর দূত এখানে এসেছিলেন এবং এই নগরী সম্পর্কে লিখে রাখেন। কম্বোজ ছিল সমৃদ্ধশালী, দেশে ছিল সুশাসন। অধিবাসীরা ছিল হিন্দু চীনা, দশ লক্ষ লোক নগরে বাস করত। রাজপ্রাসাদে সোনা ও মণিমুক্তার ছড়াছড়ি ছিল।


বেয়ন শিব মন্দির

হ্রদে বিলাসী লোকেরা নৌকা বিহার করত। রাজপথে রথ, পালকি, হাওদা লাগানো হাতি দেখা যেত। ভারতীয় ব্রাহ্মণরা এদেশে এসে বিষ্ণু ও শিবের পূজার প্রচলন করেছিলেন। এদেশের লোকদের সঙ্গে বিবাহের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে তাঁরা এদেশের জনসমাজে মিশে যান।

সপ্তম জয়বর্মন আঙ্কোরথম্ শহর নির্মাণ করেন। যশোধরপুর বা আঙ্কোরথম্ শহরের ঠিক মধ্যস্থলে ছিল বিখ্যাত বেয়ন শিব মন্দির। স্তরে স্তরে পাথর সাজিয়ে তৈরী করা হয়েছিল এই বিখ্যাত মন্দিরটি। মন্দিরের মাথায় ছিল মুকুটের মত চূড়া। চারদিকে তোরণ ছিল। তোরণের গায়ে কারুকার্য, ওপরে

ব্রহ্মার চতুর্মুখ। মন্দিরের প্রাচীরে পুরাণের ও দেবদেবীর নানা কাহিনী খোদাই করা ছিল। মন্দিরটিতে ভারতীয় শিল্পের প্রভাব লক্ষ্যণীয়। কম্বোজে বৈষ্ণব ধর্মের প্রাধান্য ছিল, পরে বৌদ্ধধর্ম প্রবল হয়ে ওঠে।

কম্বোজের বিখ্যাত আঙ্কোরভাটের বিষ্ণুমন্দিরটি নির্মাণ করেছিলেন দ্বিতীয় সূর্যবর্মন। মন্দিরটি শিল্পের অপূর্ব নিদর্শন। ঐ মন্দিরটিতেও ভারতীয় শিল্প-রীতির প্রভাব সুস্পষ্ট।



আঙ্কোরভাট

কম্বোজের পূর্ব সীমান্তে চম্পা নামে (বর্তমান আনামে) একটি হিন্দুরাজ্য ছিল। চম্পা ছিল হিন্দু সংস্কৃতির কেন্দ্র। এখানে সংস্কৃত ভাষার প্রাধান্য ছিল। বৌদ্ধধর্মের অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু শিবের প্রাধান্য বেশী ছিল।

মালয়, সুমাত্রা, বোর্ণিও, বলি, যবদ্বীপ বা জাভায় হিন্দুরাজ্য ও উপনিবেশ ছিল। সুমাত্রায় ছিল হিন্দুরাজ্য। পরে সুমাত্রা হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়। বোর্ণিওতে খ্রীস্টীয় চতুর্থ শতকে হিন্দু উপনিবেশ ছিল। ঐ দ্বীপে ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য ছিল। বলি দ্বীপেও হিন্দুরাজ্য ছিল। পরে বলিতে বৌদ্ধধর্ম প্রবল হয়ে ওঠে।

খ্রীস্টীয় প্রথম শতকে মালয়ে ভারতীয় উপনিবেশ ছিল। সেখানে ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতি প্রসার লাভ করে। ঐ দেশে নানা স্থানে বহু হিন্দুমন্দির ও বৌদ্ধ মঠের ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়।

খ্রীস্টীয় প্রথম শতকে যবদ্বীপে (জাভা) হিন্দু উপনিবেশ স্থাপিত হয়েছিল। তারপর সেখানে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি প্রসার লাভ করে।

প্রাচীনকালে যবদ্বীপে বুদ্ধ ও শিব উভয়ের পূজার প্রচলন ছিল। যবদ্বীপের নিজস্ব রামায়ণ আছে। ভারতের রামায়ণের সঙ্গে ঐ রামায়ণের যথেষ্ট পার্থক্য আছে।

খ্রীস্টীয় অষ্টম শতকে সুমাত্রা, জাভা, মালয়, বলি, বোর্ণিও প্রভৃতি নিয়ে শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে। শৈলেন্দ্র রাজগণের মূল রাজ্য ছিল মালয় অথবা যবদ্বীপে। শক্তিশালী নৌ-বাহিনীর সাহায্যে তাঁরা ঐ বিশাল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। শৈলেন্দ্র রাজগণ মহাযান বৌদ্ধধর্মের সমর্থক ছিলেন। তাঁরা ভারতবর্ষ ও চীন দুই দেশের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রাখতেন। শৈলেন্দ্ররাজ বালপুত্রদেব পালরাজ দেবপালের কাছে নালন্দায় মঠ নির্মাণের জন্য প্রার্থনা করেন। দেবপাল ঐ প্রার্থনা মঞ্জুর করে মঠের ব্যয় নির্বাহের জন্য পাঁচখানি গ্রাম দান করেন।

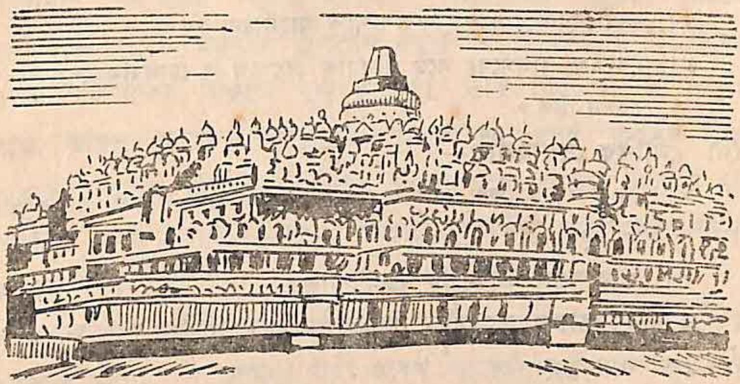
দক্ষিণ ভারতের চোল রাজগণের সঙ্গে শৈলেন্দ্র রাজগণের সংঘর্ষ চলেছিল। রাজেন্দ্র চোল শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যের একাংশ জয় করেন। ত্রয়োদশ শতকে শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যের পতন হয়।

শৈলেন্দ্র শাসনকালে যবদ্বীপের বিখ্যাত বরোবদুর মন্দিরটি নির্মিত হয়। এই বিখ্যাত বৌদ্ধ মন্দিরটি চারশ ফিট লম্বা ও চারশ ফিট চওড়া। মাটি থেকে ধাপে ধাপে উঠেছে—প্রতিটি ধাপে সাজানো আছে বুদ্ধ মূর্তি যাদের সংখ্যা মোট চারশ ছত্রিশ। ওপরে বুদ্ধের মূর্তি খোদাই করা।

মধ্যের স্তূপকে ঘিরে পরপর চক্রাকারে বাহাত্তরটি স্তূপ। এত সুন্দর পাথরের কাজ ও কারুকার্য সারা এশিয়ায় খুঁজে পাওয়া

যায় না। মন্দিরটিতে ভারতীয় শিল্প-রীতির অনুকরণ দেখতে পাওয়া যায়।

ঐ সব দেশ ছাড়াও সিয়াম বা থাইল্যাণ্ড, ভারতের প্রতিবেশী ব্রহ্মদেশ ও শ্রীলঙ্কা প্রভৃতি দেশে ভারতীয় শিল্প, সংস্কৃতি, ধর্ম প্রভৃতির



বরোবদুর

সুস্পষ্ট প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। প্রাচীনকালে ভারতীয়রা যে কূপমণ্ডুক ছিলেন না তার প্রমাণ তাঁরা রেখে গেছেন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়, মধ্য এশিয়ার নানা প্রান্তে। তাঁরা শুধু ব্যবসা-বাণিজ্য করা বা ধর্মপ্রচারের জন্য যাননি, প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে খাদ্যাভাব, দস্যুর উৎপাত বা অত্যাচারী রাজাদের অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য সব রকম বিপদকে তুচ্ছ জ্ঞান করে ভাগ্যের সন্ধানে দেশ-দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়েন এবং প্রাচীন ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির জয়পতাকা উড়িয়ে ছিলেন।

অনুশীলনী

(ক) ১। মধ্য এশিয়ার সঙ্গে ভারতের যোগাযোগের বিষয় লেখ।

২। চীনের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগের বিষয় আলোচনা কর।

৩। ভারত ও তিব্বতের সম্পর্কের ইতিহাস লেখ।

৪। কম্বোজে ভারতের সংস্কৃতির প্রসারের কথা লেখ।

৫। যবদ্বীপে ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাস লেখ।

(খ) **সংক্ষেপে উত্তর দাও :—**

১। অতীশ বা দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা কর।

২। আঙ্কোরথম্ শহরের বেয়ন মন্দিরটি সম্পর্কে যা জান লেখ।

৩। যবদ্বীপের বরোবদুর মন্দির সম্পর্কে আলোচনা কর।

৪। শৈলেন্দ্র রাজগণের সঙ্গে পালরাজ দেবপাল ও চোলরাজগণের সম্পর্ক কেমন ছিল ?

(গ) **মৌখিক প্রশ্নাবলী :—**

১। কি বিষয়কে কেন্দ্র করে মধ্য এশিয়ায় ভারতীয় সভ্যতা প্রসার লাভ করে ?

২। স্যার অরেল স্টাইন কি জন্য বিখ্যাত ?

৩। ধর্মপ্রচারের জন্য চীনে গিয়েছিলেন এমন তিনজন ভারতীয় মনীষীর নাম কি ?

৪। অতীশ বা দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান কোথায় দেহরক্ষা করেন ?

৫। আঙ্কোরথম্ শহরটি কে নির্মাণ করেন ?

৬। আঙ্কোরভাট মন্দির কার আমলে নির্মিত হয় ?

৭। শৈলেন্দ্র বংশের কোন শাসকের সঙ্গে দেবপালের যোগাযোগ হয় ?

ত্রয়োদশ অধ্যায়

দিল্লীর সুলতানী (১২০৬-১৫২৬)

৭১২ খ্রীস্টাব্দে সিন্ধু ও মুলতান জয় করে ভারতে প্রথম মুসলমান শাসনের সূচনা করেন আরবগণ। দশম শতকে আফগানিস্থানের গজনীর সুলতান সবুক্তগীন কাশ্মীর ও পাঞ্জাবের রাজা জয়পালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। তাঁর পুত্র মামুদ সতের বার ভারত আক্রমণ করেন। এদেশে ধন-সম্পদ লুণ্ঠনই ছিল মামুদের আসল উদ্দেশ্য। যদিও তিনি মুখে বলতেন ইসলাম ধর্ম প্রচারই তাঁর প্রধান লক্ষ্য। পাঞ্জাবে গজনীর শাসনের সূচনা করেন মামুদ।

রাজনৈতিক ইতিহাসঃ মামুদের দেড়শ বছর পরে ঘোর রাজ্যের সেনাপতি মহম্মদ ঘোরী এদেশ আক্রমণ করেন। লুঠ-পাট করা তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল না—তাঁর আসল লক্ষ্য ছিল এদেশে সাম্রাজ্য স্থাপন করা। মহম্মদ ঘোরীর আক্রমণকালে দিল্লী ও আজমীরের রাজা চৌহান পৃথ্বীরাজ ও কাশী ও কনৌজের গাহাড়বাল রাজা জয়চাঁদ শক্তিশালী শাসক ছিলেন। ১১৯১ খ্রীস্টাব্দে পৃথ্বীরাজ ঘোরীকে পরাজিত করেন কিন্তু পরের বছর ঘোরী জয়ী হন। জয়চাঁদ পৃথ্বীরাজকে কোনভাবে সাহায্য করেননি। কয়েক বছরের মধ্যে মহম্মদ ঘোরীর সেনাপতি কুতবউদ্দীন আইবক উত্তর ভারতের নানা অঞ্চল জয় করেন। তিনি ভারতের তুর্কী-বিজিত স্থানের শাসনকর্তা হন। মহম্মদ ঘোরী শেষজীবনে ঘোর রাজ্যের সুলতান হন। অপুত্রক অবস্থায় তাঁর মৃত্যুর পর কুতবউদ্দীন দিল্লীর প্রথম স্বাধীন মুসলমান শাসনের বা সুলতানীর প্রতিষ্ঠা করেন। দিল্লীতে দাস বংশের শাসন শুরু হয়। কুতবউদ্দীন, ইলতুৎমিস ও বলবন প্রথম জীবনে ক্রীতদাস ছিলেন—সেইজন্য দাসবংশ বলা হয়ে থাকে। কুতবউদ্দীনের পর আরম শাহকে সিংহাসন থেকে সরিয়ে সুলতান হন ইলতুৎমিস। তিনি ছিলেন

কুতবউদ্দীনের জামাতা ও বদায়ুনের শাসনকর্তা। তিনি পাঞ্জাব, সিন্ধু, বাংলায় বিদ্রোহ দমন করেন। তাঁর বুদ্ধিবলে ভারত চেঙ্গিজ খাঁর আক্রমণ থেকে রক্ষা পায়। বাগদাদের খলিফা তাঁকে সম্মান দিয়েছিলেন। ইলতুৎমিসের ইচ্ছাকে অগ্রাহ্য করে আমীর ওমরাহেরা তাঁর কন্যা রিজিয়ার বদলে তাঁর এক পুত্রকে সুলতান করেন। তাঁর অযোগ্যতায় চারদিকে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় তখন বাধ্য হয়ে রিজিয়াকে সিংহাসনে বসানো হয়। তিনি পুরুষের বেশে শাসনকার্য ও সৈন্য পরিচালনা করতেন। ওমরাহরা তাঁকে সহ্য করতে না পেরে ষড়যন্ত্র করতে থাকে—রিজিয়া নিহত হন। রিজিয়ার পরে দুজন অযোগ্য ব্যক্তি সুলতান হন। তারপর সুলতান হন ইলতুৎমিসের কনিষ্ঠ পুত্র নাসিরউদ্দীন। তিনি ছিলেন ধর্ম-প্রবণ—তাঁর মন্ত্রী বলবন তাঁর হয়ে শাসনকার্য চালাতেন। তিনি বলবনের কন্যাকে বিবাহ করেন। নাসিরউদ্দীনের পর বলবন সুলতান হন। তিনি কঠোর-শাসনের মধ্য দিয়ে দস্যু ও চক্রান্তকারীদের দমন করেন। বহু বিদ্রোহ দমন করে সীমান্তকে সুরক্ষিত করেন। তাঁর দরবারে বহু জ্ঞানী-গুণীর সমাবেশ হয়েছিল।



আলাউদ্দীন

বলবনের মৃত্যুর কয়েক বছর পরে দাস বংশের শাসনের অবসানের পর খলজী বংশের শাসন শুরু হয়। আলাউদ্দীন ছিলেন এই বংশের সবচেয়ে শক্তিশালী শাসক। তাঁর প্রচেষ্টায় কাশ্মীর, উড়িষ্যা ও আসাম বাদে সারা উত্তর ভারত বিজিত হয়। তাঁর সেনাপতি মালিক কাফুর দেবগিরি, বরঙ্গল, দোরসমুদ্র ও মবার (মাদুরা) জয় করেন। আলাউদ্দীন তাঁর বিরুদ্ধে সব কটি বিদ্রোহ দমন করেন। বিশাল সৈন্যবাহিনীকে অল্প বেতনে সন্তুষ্ট

রাখার জন্য তিনি জিনিসপত্রের বাজার দর বেঁধে দেন। শাসক ও যোদ্ধা হিসেবে নানা গুণ থাকা সত্ত্বেও নিষ্ঠুরতার জন্য তিনি কারো ভালবাসা পাননি।

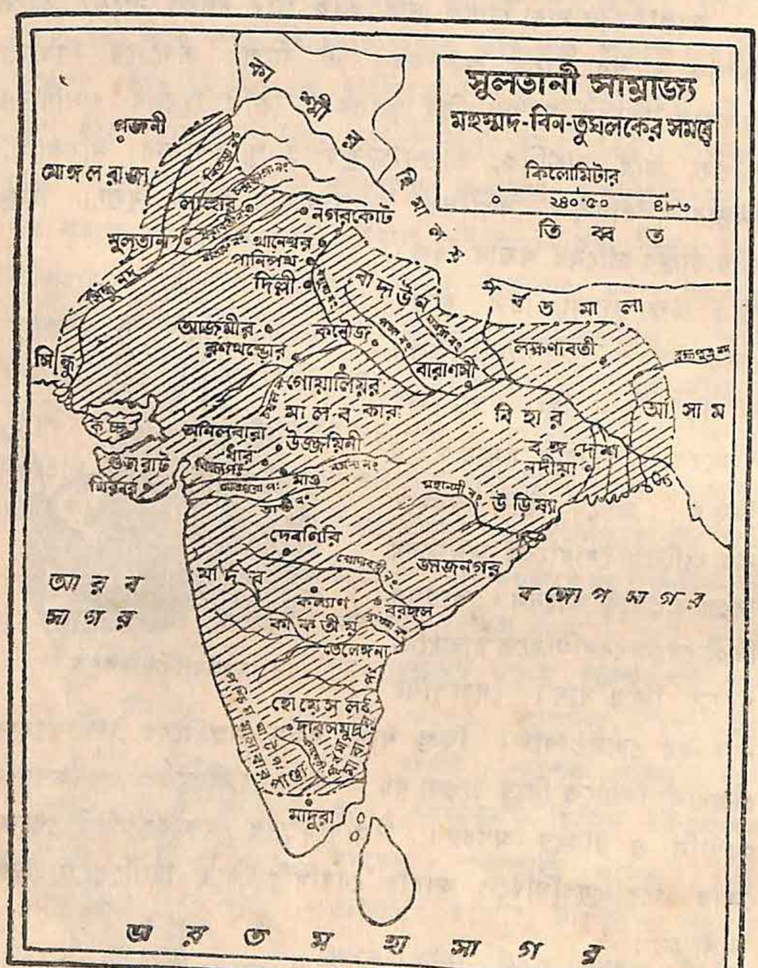
আলাউদ্দীন মারা যাবার চার বছর পরে খলজী বংশের বদলে তুঘলক বংশের শাসন শুরু হয়। ঐ বংশের সবচেয়ে বিখ্যাত সুলতান ছিলেন মহম্মদ বিন তুঘলক। তিনি ছিলেন অসাধারণ পণ্ডিত, কবি, দার্শনিক, তীক্ষবুদ্ধি-ক্ষুরধার স্মৃতিশক্তির অধিকারী, নিষ্ঠাবান, দানশীল, বিলাসিতা ও পানদোষ থেকে মুক্ত। কিন্তু তাঁর বাস্তব জ্ঞানের অভাব ছিল। তাঁর চিন্তা-ভাবনা ছিল যুগের চেয়ে অনেক বেশী প্রগতিশীল। তাছাড়া তিনি ছিলেন বড় বেশী খামখেয়ালী আবার সময়ে সময়ে নিষ্ঠুর। প্রথমে তিনি অসময়ে কর বাড়িয়ে দোয়াবের জনগণের বিদ্রোহ ডেকে আনেন। তারপর দিল্লী থেকে দেবগিরিতে রাজধানী সরিয়ে নিয়ে যান। দেবগিরির নাম হয় দৌলতাবাদ। কিন্তু নানা রকম অসুবিধের জন্য আবার রাজধানী দিল্লীতে নিয়ে যাওয়া হয়। ফলে লোকজনের হয় অনর্থক হয়রানি ও টাকার অপচয়। দিল্লীবাসীদের অকারণ দিল্লী থেকে জোর করে দেবগিরিতে আবার দেবগিরি থেকে দিল্লীতে ফিরিয়ে আনা হয়।



মহম্মদ বিন তুঘলক

তিনি টাকা দিয়ে মঙ্গোলদের বিদায় করেন। রাজকোষ শূন্য হওয়ার অবস্থা দেখা দিলে তিনি তামার নোটের প্রচলন করেন; কিন্তু নোট যাতে জাল না হয় সেরকম কোন ব্যবস্থা করেননি। ফলে বাজার জাল নোটে ভরে যায়। ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হওয়ার উপক্রম হলে তিনি বাধ্য হয়ে তামার নোট উঠিয়ে নিয়ে সকলকে

তামার নোটের দাম সোনা, রূপার টাকা দিয়ে দেন—কিন্তু রাজকোষ ফাঁকা হয়ে যায়। তাঁর পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যাওয়ায় তিনি কঠোর শাসন চালু করেন, ফলে সাম্রাজ্যের নানা প্রান্তে



বিদ্রোহ দেখা দেয়। বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত থাকার সময়ে তিনি মারা যান। তারপর ফিরোজ তুঘলক সুলতান হন। বহু বার যুদ্ধ করেও তিনি সুলতানীর সাম্রাজ্যের আগেকার আয়তন ফিরিয়ে আনতে পারেননি। তিনি বহু সংস্কার করেন। দেশে

শান্তি ফিরিয়ে আনেন। রাজস্বের হার ও শাস্তির কঠোরতা হ্রাস করেন। কৃষি ও শিল্পের উন্নতির প্রতি দৃষ্টি দেন। বহু নতুন শহর, মসজিদ, সরাইখানা, চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। তাঁর পরবর্তী সুলতানরা সকলেই ছিলেন অযোগ্য। মহম্মদ বিন তুঘলকের আমলে যে ভাঙ্গন ধরেছিল তা ঐ সময় চরম আকার নেয়। বাংলা, বিহার, জৌনপুর, গুজরাট স্বাধীন হয়ে যায়। দক্ষিণ ভারতে বাহমনী নামে মুসলমান রাজ্য ও বিজয়নগর নামে হিন্দু রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। সুলতানী শাসন ছিল দিল্লী ও চারপাশে সীমাবদ্ধ। ঐ সময়ে তুর্কী তৈমুর লঙ্ পাঞ্জাব বিধ্বস্ত করে দিল্লী লুঠ-পাট করে দিল্লীকে শ্মশানে পরিণত করেন। তুঘলকদের পরে সৈয়দ ও তারপর লোদী নামে এক আফগান বংশের শাসন শুরু হয়। সেকেন্দ্রার লোদী ছিলেন লোদী সুলতানদের মধ্যে বিখ্যাত। তিনি আগ্রা নগরীর প্রতিষ্ঠা করেন। ১৫২৬ খ্রীস্টাব্দে তৈমুরের বংশধর বাবর ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত ও নিহত করে দিল্লীর সুলতানী বা তুর্কী-আফগান শাসনের অবসান ঘটিয়ে মোগল শাসনের সূচনা করেন।

সুলতানী আমলে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থাঃ সুলতানী শাসনকালে আমরা এ দেশের যুদ্ধ-বিগ্রহ ও সভ্যতার ইতিহাস যতটা জানতে পারি সমাজ ও অর্থ নৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে ততটা জানতে পারি না। ঐ সময়কার সাহিত্য এবং বিদেশী পর্যটকদের লিখিত বিবরণ থেকে ঐ সময়কার সামাজিক ও অর্থ নৈতিক জীবন সম্বন্ধে একটা ধারণা করা যায়। মধ্য যুগে পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই ছিল শোষক ও শোষিত এই দুই শ্রেণীর অস্তিত্ব, ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে ছিল বিপুল ধনবৈষম্য। ভারতেও সেই এক চিত্র আমরা দেখতে পাই। সমাজ ছিল সামন্ততান্ত্রিক। মুষ্টিমেয় কিছু লোকের হাতে অফুরন্ত ধন-সম্পদ ছিল। ধনরত্ন ভোগ করতেন সুলতান, নবাব, রাজা, উজীর-আমীর, ওমরাহ, জায়গীরদার, জমিদারগণ। ধন-রত্নের লোভে বিদেশীরা মাঝে মাঝে এদেশে এসে লুঠ-পাট করে

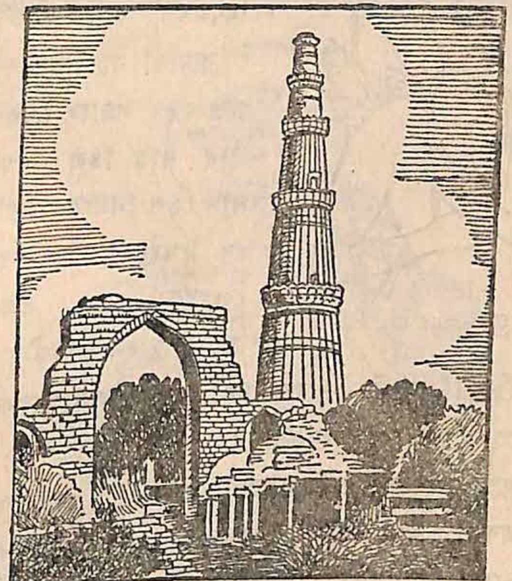
নিয়ে যেত। শোষক সম্প্রদায় ভোগ-বিলাসে ডুবে থাকত। চাষী ও সাধারণ লোককে সেই ভোগ-বিলাসের রসদ যোগান দিতে হত। খাজনার ভারে চাষী ও সাধারণ মানুষ ছিল সর্বস্বান্ত। প্রসিদ্ধ কবি আমীর খসরু লিখেছিলেন যে, "রাজমুকুটের এক একটি মুক্তা যেন গরীব চাষীর সজল আঁখি থেকে ঝরে পড়া এক একটি জমাট বাঁধা রক্তবিন্দু।"

সুলতানী আমলের সমাজে ক্রীতদাসদের গুরুত্ব ছিল। সুলতান ও আমীর ওমরাহদের অনেক ক্রীতদাস থাকত। দাসদের শ্রমে প্রভুর ধন-সম্পদ বাড়ত। দাসদের মুক্ত করাও হত। মুক্ত দাস যোগ্যতাবলে সামাজিক মর্যাদা ও উঁচু সরকারী পদ এমন কি সুলতানও হতে পারত।

সুলতানী আমলে মেয়েরা ছিল পুরুষের অধীন। পর্দা প্রথার প্রচলন ছিল। অল্প বয়সে বিবাহের রেওয়াজ ছিল। পুরুষদের মধ্যে বহু বিবাহের প্রচলন ছিল। হিন্দু মেয়েদের মধ্যে সহমরণ প্রথারও প্রচলন ছিল। বিত্তশালী ঘরের মেয়েদের নানা গুণ ও সামাজিক প্রতিষ্ঠার পথ খোলা ছিল।

হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতির সমন্বয়ঃ সুলতানী আমলে হিন্দু ও মুসলমান—এই দুই সম্প্রদায় বহুদিন এক সঙ্গে বসবাস করবার ফলে একে অন্যকে প্রভাবিত করে। দুই ধর্মের সংস্কৃতির প্রভাব দেখা যায় শিল্পে, সংস্কৃতি ও ধর্মে। সুলতানগণ, প্রাদেশিক শাসনকর্তারা, হিন্দু রাজারা অনেক প্রাসাদ, মন্দির, মসজিদ, স্তম্ভ, সমাধিভবন তৈরী করিয়েছিলেন। ঐগুলির কয়েকটি ছিল মুসলমান স্থাপত্য ও শিল্পরীতির নিদর্শন আবার কতকগুলি ছিল হিন্দু শিল্প ও স্থাপত্যরীতির নিদর্শন। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হিন্দু ও মুসলিম দুই রীতির সংমিশ্রণ দেখা যায়। শিল্পীদের অনেকে ছিলেন হিন্দু, রাজা মুসলমান। কাশ্মীর, জৌনপুর, মালব, গুজরাট, বাংলার স্থাপত্যে ও দিল্লীর কুতবমিনার ও আজমীরের মসজিদে সংস্কৃতির সমন্বয় দেখা যায়।

সাহিত্যেও সংস্কৃতির সমন্বয় দেখা যায়। ফিরুজ তুঘলক, সেকান্দ্রার লোদী সংস্কৃত গ্রন্থের ফারসী অনুবাদ করিয়েছিলেন। কাশ্মীরের জয়নাল আবেদিনের উৎসাহে মহাভারত ও রাজতরঙ্গিনীর ফারসী অনুবাদ করা হয়। বাংলায় হোসেন শাহের সময়



কুতব মিনার

মহাভারতের বাংলা অনুবাদ করা হয়। ফারসী ও হিন্দী ভাষার সংমিশ্রণে উর্দু ভাষার সৃষ্টি হয়।

হিন্দু ও মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে একদল সাধু-সন্তের আবির্ভাব হয়। তাঁরা বলতেন ঈশ্বর এক, তিনি থাকেন মানুষের মধ্যে, সকল মানুষই সমান, মানুষের মধ্যে জাতিভেদ নেই। পূজা-অর্চনার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না, ঈশ্বরকে পাওয়া যায় মানুষকে ভালবাসার মধ্য দিয়ে। ঐ মতবাদ ভক্তিবাদ নামে পরিচিত। মুসলমান সুফী-সাধুরাও ঐ একই মত প্রচার করতেন। সুলতানী আমলে সুফী-সাধু ছিলেন নিজামুদ্দিন আউলিয়া ও খাজা মৈনুদ্দিন চিশতি। ভক্তিবাদের প্রচার করেন রামানন্দ, বল্লভাচার্য,

শ্রীচৈতন্য, কবীর, নানক, নামদেব, রবিদাস প্রমুখ। এখন তোমাদের শ্রীচৈতন্য, নানক ও কবীর সম্বন্ধে কিছু বলছি।


শ্রীচৈতন্য

শ্রীচৈতন্য ভক্তিবাদের প্রচারবাদের মধ্যে বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন। ১৪৮৬ খ্রীস্টাব্দে ১৮ই ফেব্রুয়ারী বাংলার নবদ্বীপে তাঁর জন্ম হয়। সন্ন্যাস নেওয়ার আগে তাঁর নাম ছিল বিশ্বম্ভর, অন্য নাম ছিল নিমাই। তিনি বলতেন যে ঈশ্বরকে লাভ করতে গেলে প্রেমের দ্বারা সম্ভব। তাঁর প্রচারিত ধর্ম গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম নামে পরিচিত। তিনি ছিলেন ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারক। তিনি জাতিভেদ প্রথাকে স্বীকার করতেন না।

শ্রীচৈতন্যের মত ভক্ত কবীর বলতেন 'পরমাত্মা এক'। রাম, রহিম, আল্লা ও হরির মধ্যে কোন প্রভেদ নেই। তিনি জাতিভেদ ও হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে ভেদাভেদ স্বীকার করতেন না।


কবীর

শিখ ধর্মের প্রবর্তক নানকও ছিলেন ভক্তিবাদে বিশ্বাসী। তিনি বলতেন সকল মানুষই ঈশ্বরের সন্তান, মানুষে মানুষে কোন প্রভেদ নেই—যে ভেদাভেদ দেখা যায় তা মানুষের তৈরী।

ইলিয়াস শাহী ও হোসেন শাহী আমলে বাংলার সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থাঃ দিল্লীর সুলতানীর দুর্বলতার সুযোগে বাংলার মুসলমান শাসকেরা বাংলায় স্বাধীন সুলতানীর প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলার স্বাধীন সুলতানী শাসনকালে ইলিয়াস

শাহী ও হোসেনশাহী আমল বিশেষ গৌরবময়। ঐ সময়ে বাংলা যে শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতা ভোগ করে তা নয় বাংলার সংস্কৃতির অভাবনীয় উন্নতি হয়।

মধ্যযুগে ভারতের সর্বত্র যে সমাজ-চিত্র দেখতে পাওয়া যায় বাংলায় তার অন্যথা হয়নি। এখানে মুষ্টিমেয় শোষকশ্রেণীর হাতে

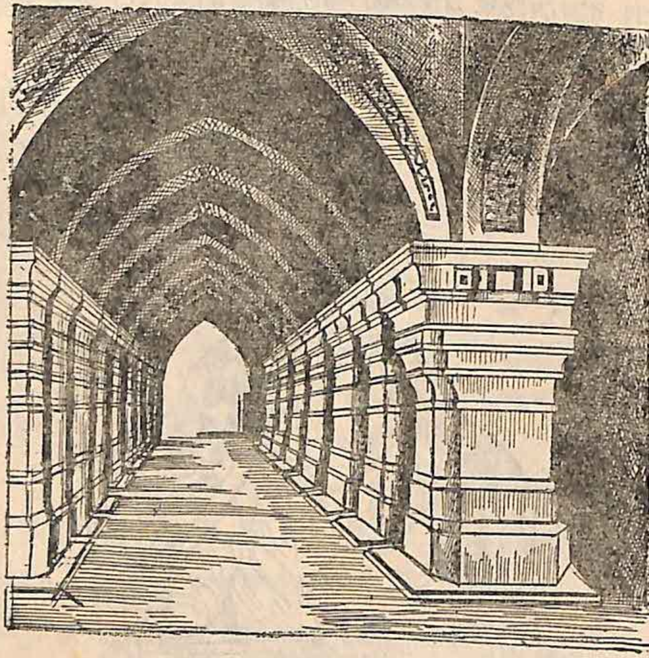


নানক

ছিল বিপুল ধনসম্পদ আর অগণিত সাধারণ মানুষ ও চাষীরা ছিল শোষিত, করভারে জর্জরিত। সমাজে নানা বৃত্তিভোগী লোক ছিল। যাই হোক্ সমাজে হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতির সমন্বয় ঘটেছিল। হিন্দুদের মধ্যে অনেকে মুসলমানদের চালচলন নকল করে পোশাক পরত, দাড়ি রাখত, ফারসী ভাষা শিখত। মুসলমানরাও হিন্দুদের কিছু কিছু আচার ও প্রথা গ্রহণ করেছিল। হোসেন শাহের আমলে সত্যপীরের পূজার প্রচলন হয়। মুসলমানরা বলত সত্যপীর আর হিন্দুরা বলত সত্যনারায়ণ। হিন্দুরা মুসলমান পীর-ফকিরদের ভক্তি করত।

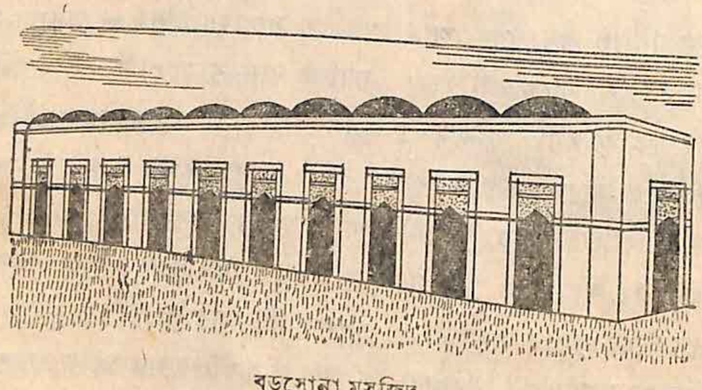
সুলতানী আমলে ভাগবত, পুরাণ, মহাভারত বাংলায় অনুবাদ করা হয়, মঙ্গলকাব্য রচিত হয়। মালাধর বসু, বিপ্রদাস, বিজয় গুপ্ত,

রূপ গোস্বামী, সনাতন গোস্বামীর ন্যায় সাহিত্যসেবীদের আবির্ভাব



আদিনা মসজিদ

হয়। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের ফলে তাঁর জীবনকে কেন্দ্র করে সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়।



বড়সোনা মসজিদ

সুলতানী আমলে বাংলায় আদিনা মসজিদ; ছোট সোনা মসজিদ, বড়সোনা মসজিদ, ষাট গম্বুজ, একলাক্ষী প্রাসাদ

নির্মিত হয়। ঐ সব স্থাপত্যে হিন্দু ও মুসলিম শিল্প-রীতির প্রভাব সুস্পষ্ট।

বাংলার সুলতানী আমলে শস্য-সম্পদ ও শিল্প-বাণিজ্য বাংলা দেশকে ধনসম্পদে সমৃদ্ধশালী করে তোলে। বাংলা স্বাধীন থাকায় বাংলার ধন-সম্পদের শোষণের সম্ভাবনা ছিল না। বাংলার বণিকেরা জলপথে ভারতের নানা বন্দরে এমন কি মহাদেশ ইন্দোনেশিয়া ও ইন্দোচীনে যেতেন।

সুলতানী আমলে ভারতের শাসন-ব্যবস্থা

দিল্লীর সুলতানী ছিল ধর্মাশ্রয়ী। কাগজে-কলমে সুলতান ছিলেন মুসলমান ধর্মজগতের গুরু খলিফার প্রতিনিধি। বাস্তবে সুলতানের ক্ষমতার ওপর কোন আইনের বাধা ছিল না। তিনি ছিলেন সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তাঁর ক্ষমতার উৎস ছিল সামরিক শক্তি। শাসন-ব্যবস্থা ছিল সামন্ততান্ত্রিক। সামরিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতির বদলে আমীর ওমরাহ ও প্রাদেশিক শাসনকর্তারা ক্ষমতা ভোগ করতেন। ওয়াজীর ছিলেন প্রধান মন্ত্রী, তাছাড়া আরও অনেক উচ্চপদস্থ কর্মচারীর সাহায্য নিয়ে সুলতান সাম্রাজ্য শাসন করতেন। সাম্রাজ্য কয়েকটি প্রদেশে ভাগ করা হত। প্রদেশের শাসককে বলা হত ওয়ালি বা মুক্তি, বড় প্রদেশের শাসনকর্তাকে বলা হত শিকদার, প্রদেশগুলিকে পরগনায় আর পরগনাকে গ্রামে ভাগ করা হত। এক কথায় ঐ যুগের শাসন-ব্যবস্থা ছিল সামন্ততান্ত্রিক ও স্বৈরাচারী।

অনুশীলনী

(ক) ১। দিল্লীর সুলতানীর প্রতিষ্ঠার ইতিহাস লেখ।

২। আলাউদ্দিন খলজী সম্বন্ধে যা জান লেখ।

৩। মহম্মদ বিন তুঘলক সম্বন্ধে যা জান লেখ।

৪। সুলতানী আমলের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার বিবরণ দাও।

৫। সুলতানী আমলে হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির সমন্বয়ের ইতিহাস লেখ।

৬। বাংলার স্বাধীন সুলতানী শাসনকালে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থ নৈতিক অবস্থার বিবরণ দাও।

(খ) **টীকা লেখ :** (১) মহম্মদ বিন তুঘলকের সময়ে রাজধানী স্থানান্তরিতকরণ। (২) তামার টাকার প্রবর্তন (৩) ফিরোজের সংস্কার (৪) শ্রীচৈতন্য (৫) কবীর (৬) নানক (৭) সুলতানী আমলে ভারতের শাসন-ব্যবস্থা।

(গ) **মৌখিক প্রশ্নাবলী :**

১। দিল্লীর সুলতানীর কে সূচনা করেন ?

২। ইলতুৎমিসের আমলে কার নেতৃত্বে মঙ্গোলরা এদেশে আসে ?

৩। তৈমুর লঙ্ কে ছিলেন ?

৪। সাধারণ মানুষের উপর শাসকের শোষণ সম্পর্কে আমীর খসরু কি বলেছেন ?

৫। কোন্ কোন্ ভাষার সমন্বয়ে উর্দু ভাষার সৃষ্টি হয় ?

৬। এক কথায় সুলতানী আমলের শাসন-ব্যবস্থাকে কি বলা যায় ?

চতুর্দশ অধ্যায়

অবসানের পথে মধ্য যুগ

তোমরা মধ্য যুগের পৃথিবীর নানা দেশের কথা জেনেছ। এখন তোমাদের মধ্য যুগের অবসানের বিষয় বলছি। মধ্য যুগের অবসানের সঙ্গে কনস্ট্যান্টিনোপল নগরীর পতন অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত।

কনস্ট্যান্টিনোপলের পতন ও নবজাগরণে তার প্রভাব :— কনস্ট্যান্টিনোপল নগরী ছিল রোমের পূর্বদিকের সাম্রাজ্য বা বাইজ্যান্টাইন সাম্রাজ্যের রাজধানী—একথা নিশ্চয় তোমাদের মনে আছে? খ্রীস্টীয় পঞ্চম শতকে জার্মান-জাতিসমূহের আক্রমণের ফলে পশ্চিম রোম সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে যায়। কিন্তু পূর্ব রোম সাম্রাজ্য অক্ষুণ্ণ থাকে আরও হাজার বছর। জার্মান-জাতির আক্রমণে পশ্চিম ইওরোপে গ্রীক ও রোমক সভ্যতা ও সংস্কৃতি নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু পূর্ব রোম সাম্রাজ্যে ও রাজধানী কনস্ট্যান্টিনোপল নগরীতে গ্রীক-রোমক সভ্যতা ও সংস্কৃতির চর্চা অব্যাহত থাকে। ১৪৫৩ খ্রীস্টাব্দে 'অটোমান তুর্ক'রা কনস্ট্যান্টিনোপল অধিকার করে। তাদের আদি ভূমি তুর্কীস্থান, সেখান থেকে মঙ্গোল নায়ক চেঙ্গিজ খাঁ তাদের বিতাড়িত করেন, তারপর তারা আনাতোলিয়ায় স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করে। ওসমান ছিলেন অটোমান তুর্কদের প্রথম স্বাধীন রাজা। ঐ সময়ে সেলজুক তুর্ক ও বাইজ্যান্টাইন সাম্রাজ্য ছিল দুর্বল। ঐ অবস্থার সুযোগে অটোমান তুর্করা কনস্ট্যান্টিনোপলের চারপাশে আধিপত্য বিস্তার করে। চোদ্দ শতকের শেষে তুর্ক সুলতান বায়াজিদ ফ্রান্স, পোল্যাণ্ড ও হাঙ্গেরীর মিলিত বাহিনীকে হারিয়ে দেন, তিনি কনস্ট্যান্টিনোপল নগরী অবরোধ করেন। কিন্তু চাঘতাই তুর্কী নেতা তৈমুর লঙ্‌ অটোমান রাজ্য আক্রমণ করায় ঐ সময় কনস্ট্যান্টিনোপল রক্ষা পায়। ১৪০২ খ্রীস্টাব্দে বায়াজিদ পরাজিত ও বন্দী হন। ঐ ঘটনার ষোল বছর পরেই অটোমান তুর্করা আবার কনস্ট্যান্টিনোপল আক্রমণ করে, কিন্তু দখল করতে পারেনি। শেষে ১৪৫৩ খ্রীস্টাব্দে

তুর্ক নায়ক দ্বিতীয় মহম্মদ দেড় লক্ষ সৈন্য ও বিশাল নৌ-বাহিনী নিয়ে কনস্ট্যান্টিনোপল অবরোধ করেন। নগরী রক্ষার জন্য ছিল মাত্র আট হাজার সৈন্য। দুমাস অবরোধের পর তুর্করা দুর্গে ঢুকে পড়ে। সম্রাট একাদশ কনস্ট্যান্টাইন ও বহু সৈন্য যুদ্ধে প্রাণ দিলেন। চল্লিশ হাজার লোককে তুর্করা হত্যা করে আর পঞ্চাশ হাজার লোককে দাস বানায়। হাজার বছরের পুরানো পূর্ব-রোম বা বাইজ্যান্টাইন সাম্রাজ্যের পতন হয়। সেণ্ট সোফিয়া গীর্জাকে করা হয় মসজিদ।

কনস্ট্যান্টিনোপল নগরীর পতনের সাথে ইওরোপে রেনেসাঁ বা নব-জাগরণের সূচনা বলে অনেকে মনে করেন। কিন্তু কনস্ট্যান্টিনোপলের পতনের বহু আগেই নবজাগরণের সূচনা হয়েছিল। কনস্ট্যান্টিনোপলের পতন নবজাগরণকে জোরদার করে। তোমাদের আগেই বলেছি যে কনস্ট্যান্টিনোপল নগরী ছিল গ্রীক-রোমান সভ্যতা ও সংস্কৃতির চর্চা-কেন্দ্র। ঐ নগরীর পতনের পর বহু পণ্ডিত পুঁথিপত্র নিয়ে ইটালীর ভেনিস, জেনোয়া প্রভৃতি নগরে আশ্রয় নেন। ফলে ইটালীতে প্রাচীন বিদ্যার চর্চা নতুন করে শুরু হয়। চিন্তাধারায় আসে পরিবর্তন, মনোজগতে সৃষ্টি হয় আলোড়নের। নতুন করে শিল্প, স্থাপত্য, সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শনচর্চা শুরু হয়। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে ইওরোপের ভাবজগতের এই পরিবর্তনকে বলে রেনেসাঁ বা নবজাগরণ।

রেনেসাঁ যুগের বৈশিষ্ট্যঃ রেনেসাঁর কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ছিল। মধ্যযুগে পড়াশোনার প্রধান বিষয়বস্তু ছিল ধর্মতত্ত্ব, কিন্তু নবজাগরণের সময় মানুষের ভালো লাগে এমন সকল বিষয়ের পড়াশোনা চলতে থাকল। ঐ সময়কার ইটালীর পণ্ডিত পেত্রার্ক, বোকাশিও প্রমুখ হিউম্যানিস্ট নামে পরিচিত। এই সংস্কৃতি ছিল বুর্জোয়া সংস্কৃতি, বণিকরাই ছিল হিউম্যানিস্টদের ও হিউম্যানিজমের প্রধান সহায়।

জানার আগ্রহ ও যুক্তিবাদঃ রেনেসাঁর আর এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল সেকালের মানুষের মধ্যে নানা বিষয়ে জানার আগ্রহ আর যুক্তির মাপকাঠিতে সব কিছুকে যাচাই করা। প্রাচীন বিদ্যার

সঙ্গে নোতুন করে পরিচয়ের ফলে মানুষের মধ্যে অন্ধ-বিশ্বাস ও কুসংস্কারের বদলে যুক্তিবাদের প্রাধান্য দেখা দেয়। কোন ঘটনাকে সত্য বলে স্বীকার করার আগে মানুষ সেগুলিকে যুক্তি দিয়ে যাচাই করতে থাকে। মানুষের মন হয়ে পড়ে যুক্তিবাদী আর সমালোচনা করা যেন মানুষের স্বভাব হয়ে দাঁড়ায়। জানার আগ্রহ আর যুক্তিবাদের প্রভাব দেখা যায় শিল্প, সাহিত্য, স্থাপত্য, চিত্রকলা, সঙ্গীত নানা ক্ষেত্রে। রেনেসাঁর যুগে আবির্ভাব ঘটেছিল লিওনার্ডো দ্য ভিঞ্চি, মাইকেল এ্যাঞ্জেলো, র‍্যাফেল, টিসিয়ান প্রমুখ শিল্পী ও স্থপতিদের।

আবিষ্কার ও জ্ঞানের প্রসারঃ মানুষের মধ্যে জানার আগ্রহের ফলে নানা রকম কাল্পনিক বিষয়বস্তুকে ভিত্তি করে বহু বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সম্ভব হয়েছিল। কোপারনিকাস নামে এক বৈজ্ঞানিক সর্বপ্রথম বলেন যে আমরা খালি চোখে যা দেখি যে সূর্য পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরছে তা ঠিক নয়—পৃথিবীই সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে। এইভাবে তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞানে টলেমির প্রচলিত মতবাদকে অস্বীকার করে আলোড়নের সৃষ্টি করেন। কেপলার নামে আর এক বৈজ্ঞানিক কোপারনিকাসের মতবাদকে আরও প্রসার করেন। দূরবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কার করেন বৈজ্ঞানিক গ্যালিলিও। তিনি কোপারনিকাসের মতবাদকে সত্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেন। অবশ্য তাঁকে প্রচলিত ধারণার বিরোধিতা করার জন্য অমানুষিক নির্যাতন সহ্য করতে হয়।

রেনেসাঁস যুগে ছাপাখানার আবিষ্কার হয়। আগে বই ছিল সংখ্যায় খুবই কম, হাতে লেখা পুঁথি সহজলভ্য ছিল না—ফলে লেখা-পড়ার সুযোগ ছিল খুবই সীমিত। ছাপাখানা আবিষ্কারের ফলে বই-এর সংখ্যা বেড়ে যায়। বই হয়ে পড়ে সহজলভ্য। ফলে মানুষের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটে। মাতৃভাষায় সাহিত্য রচনার ফলেও জ্ঞানের প্রসার হয়। চসার ইংরেজী ভাষায় ক্যাণ্টারবেরিস টেলস, দান্তে ইতালীয় ভাষায় দি-ডিভাইন কমেডি, কারেভেনটিস স্পেনীয় ভাষায় বই লেখেন, দুরূহ লাটিন আর শিক্ষার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় না।

রেনেসাঁর যুগে বারুদের আবিষ্কার বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বারুদ দিয়ে তৈরী কামানের গোলার আঘাতে সামন্তদের শক্তির উৎস দুর্গগুলির প্রাচীর ভেঙ্গে পড়ে, সামন্তদের ক্ষমতা কমে যায়। সামন্ততন্ত্রের আয়ু শেষ হয়ে যায়।

রেনেসাঁর যুগে নাবিকদের দিক্-নির্ণয়কারী যন্ত্রের আবিষ্কারও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ঐ আবিষ্কারের ফলে সমুদ্রে রাত্রে জাহাজ চালানো অনেক সহজ ও নিরাপদ হয়ে পড়ে। ইওরোপের বিভিন্ন দেশের লোকজনের মধ্যে সমুদ্রপথে নানা দেশে পাড়ি দেওয়ার এক উন্মাদনা দেখা দেয়।

ভৌগোলিক আবিষ্কারসমূহ ও তার প্রতিক্রিয়াঃ কেবল দিক-নির্ণয় যন্ত্রের আবিষ্কার নয়, আরও নানা কারণে ভৌগোলিক আবিষ্কার সম্ভব হয়েছিল। প্রধান কারণ ছিল বাণিজ্যিক। ১৪৫৩ খ্রীস্টাব্দে অটোমান তুর্কীরা কনস্ট্যান্টিনোপল অধিকার করার পর প্রাচ্যের নানা দেশের সঙ্গে ইওরোপের যে পথে বাণিজ্য চলত তা অবরোধ করে। প্রাচ্যের পণ্য সামগ্রী আরব বণিকেরা ইটালীর ভেনিস, জেনোয়ার বণিকদের কাছে চড়া দামে বিক্রী করত। ইটালীর বণিকেরা ইওরোপের নানাদেশে সেই পণ্য-সামগ্রী আরও চড়া দামে বিক্রী করত। সেই কারণে ইওরোপের স্পেন, পর্তুগাল প্রভৃতি দেশের লোকেরা প্রাচ্যের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য নতুন জলপথ আবিষ্কারের বিষয় চিন্তা করেন। বহু দেশ নৌ-অভিযান পাঠায়, তার ফলে আমেরিকার মত বহু নতুন নতুন ভূখণ্ডের আবিষ্কার হয়।

নতুন নতুন দেশ আবিষ্কার করে সেই সব দেশে পবিত্র খ্রীস্টান ধর্ম প্রচারের বাসনাতেও বহু ধর্মপ্রচারক দেশ ছেড়ে অজানার পথে পাড়ি দেন।

ভাগ্য ফেরানোর জন্য বহু লোক অজানা পথে পাড়ি দেয়। মার্কোপোলোর কথা নিশ্চয় তোমাদের মনে আছে? মার্কোপোলোর ভ্রমণ বিবরণী পড়ে বহু লোক নতুন দেশ আবিষ্কারে আগ্রহী হয়ে

ওঠেন। দিক-নির্ণয় যন্ত্র ছাড়াও মানচিত্র, সমুদ্রপথে পাড়ি দেওয়ার জন্য নতুন ধরণের জাহাজ সমুদ্রযাত্রাকে আগের চেয়ে নিরাপদ করে তোলে। ইওরোপের নানা দেশের নাবিকেরা সমুদ্রযাত্রা করেন, সমুদ্রযাত্রায় পথপ্রদর্শক দেশ পর্তুগাল। পর্তুগালের নাবিক রাজকুমার হেনরীর আগ্রহে আটলান্টিক মহাসাগর পাড়ি দিয়ে নাবিকেরা আজোর্স, মেড়িরা, কেপ ভার্ডে আবিষ্কার করে। ১৪৮৬ খ্রীস্টাব্দে পর্তুগীজ বার্থালো মিউ ডায়াজ আফ্রিকার দক্ষিণতম প্রান্তে হাজির হন। সেই পথ ধরে পর্তুগীজ ভাস্কো-ডা-গামা ভারতের কালিকটে এসে হাজির হন। স্পেনের রাজা ও রাণীর সাহায্য ও সমর্থন পেয়ে জেনোয়াবাসী নাবিক ক্রিস্টোফার কলম্বাস ১৪৯২ খ্রীস্টাব্দে কিউবা, বাহামা, হাইতি প্রভৃতি আমেরিকার কাছাকাছি দ্বীপগুলিতে গিয়ে পৌঁছান। আরও দুবার নৌ-অভিযানের পর তিনি আমেরিকা যান। আমেরিগো ভেসপুচি নামে এক নাবিক আমেরিকাকে একটি মহাদেশ বলে জানান। কলম্বাস জানতেন না যে তিনি একটি নতুন মহাদেশ আবিষ্কার করেছেন। তাঁর ধারণা ছিল যে তিনি ভারতের কাছাকাছি কোথাও গিয়েছিলেন।

জন ক্যাবট ও সেবস্টিয়ান ক্যাবট ইংলণ্ডের রাজার সমর্থন পেয়ে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডে যান। পর্তুগীজ ক্যাব্রাল ব্রেজিলে যান। এরপর স্পেনের বালবোয়া প্রশান্ত মহাসাগর ও ম্যাগেলান ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ আবিষ্কার করেন। ষোড়শ শতকে নতুন দেশ আবিষ্কারের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে।

ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফলে ইওরোপের মানুষের পৃথিবীর পরিধি সম্বন্ধে জ্ঞানের প্রসার হয়। চার্চের ওপর আস্থা কমে যায়। এত দিন পৃথিবী সম্বন্ধে চার্চ যে ধারণা দিয়ে এসেছিল তা ভুল বলে প্রমাণিত হয়। নতুন নতুন দেশের লোকজনের সংস্পর্শে আসায় ইউরোপীয়দের দৃষ্টিভঙ্গীতে পরিবর্তন আসে। ইটালীর শহরগুলির প্রাধান্য হ্রাস পায়। স্পেন ও পর্তুগালের প্রাধান্য বেড়ে যায়। বড় আকারে ব্যবসা-বাণিজ্য চালানো ও

তার মূলধন যোগানের জন্য যৌথ সংস্থা গড়ে ওঠে। আবার ইওরোপের কিছু কিছু লোক কুখ্যাত দাস-ব্যবসায়ে লিপ্ত হয়ে পড়ে। জলপথে ব্যবসা-বাণিজের ফলে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। তারাই ভবিষ্যতে দেশের রাজনীতি পরিচালনা করে। ইওরোপের নৌ-শক্তিতে শক্তিশালী দেশগুলির মধ্যে ইওরোপের বাইরে নানা দেশে উপনিবেশ স্থাপনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয় যার ফলে ভবিষ্যতে এশিয়া ও আফ্রিকার নানা দেশের স্বাধীনতা বিপন্ন হয়।

জাতীয়-রাষ্ট্রের উদ্ভব ঃ মধ্য যুগের শেষ ভাগে আর আধুনিক যুগের সূচনায় ইউরোপের কয়েকটি দেশে শক্তিশালী রাজবংশ ও জাতীয় রাষ্ট্রের উত্থান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পঞ্চদশ শতকে সামন্ততন্ত্র দুর্বল হয়ে পড়ে। গ্রামে ও শহরে শ্রেণীভেদ প্রবল হওয়ায় শক্তিশালী শাসনের প্রয়োজন হয়। গ্রামে ও শহরের নতুন শোষক শ্রেণী কেন্দ্রীভূত শাসনের পক্ষে থাকে, ফলে রাজাদের ক্ষমতা বাড়তে থাকে। ইংলণ্ডে ত্রিশ বর্ষব্যাপী গৃহযুদ্ধে সামন্তগণ দুর্বল হয়ে পড়ে, সেই সুযোগে সেদেশে টিউডর বংশের নেতৃত্বে শক্তিশালী রাজ্য গড়ে ওঠে। ফ্রান্সে নবম লুই বার্গাণ্ডি ও প্রভেন্স জয় করেন এবং তাঁর পুত্র অষ্টম চার্লস ব্রিটানি জয় করেন। তাঁরা ফ্রান্সে ঐক্যের প্রতিষ্ঠা করে কেন্দ্রীভূত শাসন প্রবর্তন করেন। স্পেনের রাজা ফার্ডিনাণ্ড্ ইসাবেলাকে বিবাহ করে আরাগন ও ক্যাসটিল (Custile)-কে ঐক্যবদ্ধ করেন। মুরদের কাছ থেকে গ্রানাডা ও নাভারে জয় করে স্পেনে কেন্দ্রীভূত শাসনের প্রতিষ্ঠা করেন। পর্তুগাল ও হল্যাণ্ডেও জাতীয়-রাষ্ট্র প্রসার লাভ করে। প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামে অভ্যস্ত হল্যাণ্ডের ইউনাইটেড প্রভিন্সের অধিবাসীরা স্পেনরাজের স্বৈরাচারী শাসন প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে সফল হন।

ইউরোপের সম্প্রসারণ ঃ এদিকে ইওরোপের দেশগুলি ইউরোপের বাইরে নতুন আবিষ্কৃত ভূখণ্ডে উপনিবেশ স্থাপন করে। স্পেন, মেক্সিকো, পেরুতে, এক কথায় ব্রেজিল বাদে উত্তর ও

দক্ষিণ আমেরিকায় বিশাল উপনিবেশ স্থাপন করে। পর্তুগাল ও ভারতের গোয়া, দমন, দিউ, আফ্রিকার মোজাম্বিক ও এ্যাঙ্গোলায় দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজিলে উপনিবেশ স্থাপন করে।

পরে ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও হল্যাণ্ড উপনিবেশ প্রতিষ্ঠায় অংশ নেয়। স্পেনের শক্তি হ্রাস পাওয়ায় শেষ পর্যন্ত উপনিবেশ স্থাপনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে—শেষ পর্যন্ত ইংলণ্ড জয়ী হয়।

নতুন ব্যবস্থা বনাম পুরাতন ব্যবস্থা—ইংলণ্ডে বিদ্রোহ ঃ মধ্য যুগের শেষে ইউরোপের সব জায়গায় পুরাতন ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে। ষোড়শ শতকে জার্মানীতে মার্টিন লুথারের নেতৃত্বে ধর্মসংস্কার আন্দোলনের ফলে খ্রীস্টধর্ম—রোমান ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যাণ্ট্ দুই শাখায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। খ্রীস্টধর্ম জগতের আদর্শ ধ্বংস হয়ে যায়, জাতির আদর্শ জনগণের মনে দেখা দেয়। সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ও অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে। পুরাতন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে মানুষ বিদ্রোহ শুরু করে। জাতীয়তাবোধ ও জাতির আদর্শ গড়ে ওঠায় পোপের প্রাধান্য চলে যায়।

এখন তোমাদের ইংলণ্ডের এক বিদ্রোহের সম্বন্ধে জানাচ্ছি। ভূমিদাস প্রথার শেষ দিকে প্রভুর জমিতে বেগার খাটার বদলে পারিশ্রমিক হিসেবে নগদ পয়সা দেওয়া যেত। ১৩৪৭—১৩৫০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যের সময়ে 'ব্ল্যাক ডেথ' নামে এক প্লেগ মহামারীতে প্রায় ১/৩ জনসংখ্যা কমে যায়। মজুরের সংখ্যা কমে যাওয়ায় মজুরীর হারও বেড়ে যায়। জমিদারদের সুবিধের জন্য পার্লামেণ্ট শ্রমিক-আইন পাস করে ১৩৪৭ খ্রীস্টাব্দ সময়ের হারে মজুরী নিতে বলে। সব রকম শাস্তির ভয়কে উপেক্ষা করে জন বল নামে এক পুরোহিতের অনুপ্রেরণায় ইংলণ্ডের চাষীরা ১৩৮১ খ্রীস্টাব্দে ওয়াট টাইলারের নেতৃত্বে বিদ্রোহ করে। অল্প বয়স্ক রাজা দ্বিতীয় রিচার্ডের কথায় বিদ্রোহীরা শান্ত হন, কিন্তু প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে বিদ্রোহের নেতাদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হয়।

কিন্তু সমাজে যেমন শোষণের শেষ নেই, তেমনই শোষিত মানুষের শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামেরও শেষ নেই। এইভাবে প্রচলিত ব্যবস্থাকে ভাঙতে ভাঙতে মানব-সভ্যতা প্রগতি ও পূর্ণতার পথে এগিয়ে চলেছে।

অনুশীলনী

(ক) ১। কনস্ট্যান্টিনোপলের পতন ও নবজাগরণে তার প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা কর।

২। রেনেসাঁ যুগের বৈশিষ্ট্যগুলির উল্লেখ কর।

৩। বিভিন্ন আবিষ্কার জ্ঞানের প্রসার ঘটাতে কিভাবে সাহায্য করে ?

৪। ভৌগোলিক আবিষ্কার ও তার প্রতিক্রিয়ার উল্লেখ কর।

(খ) **সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :**

১। জাতীয় রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্পর্কে যা জান লেখ।

২। নতুন ব্যবস্থা বনাম পুরাতন ব্যবস্থার বিষয়ে আলোচনা কর।

(গ) **মৌখিক প্রশ্নাবলী :**

১। কত খ্রীস্টাব্দে কনস্ট্যান্টিনোপলের পতন হয় ?

২। রেনেসাঁর যুগের কয়েকজন শিল্পীর নাম বল।

৩। কোপারনিকাস কি জন্য বিখ্যাত ?

৪। গ্যালিলিও কে ছিলেন ?

৫। কলম্বাস কেন বিখ্যাত ?

৬। ওয়াট টাইলার কোন্ ঘটনার নেতা ছিলেন ?

সম্পূর্ণ

ঘটনাপঞ্জী

[বর্তমান পুস্তক অনুসারে]

ভিসিগথদের রোম আক্রমণ ...	— ৪০০ খ্রীঃ
এ্যালারিক কর্তৃক রোম ধ্বংস ...	— ৪১০ খ্রীঃ
এ্যাটিলার রোম সাম্রাজ্য আক্রমণ ...	— ৪৫২ খ্রীঃ
পশ্চিম রোম সাম্রাজ্য ধ্বংস ...	— ৪৭৬ খ্রীঃ
'অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ' ? ...	৪০০ খ্রীঃ— ৮০০ খ্রীঃ
জ্যাস্টিনিয়ানের রাজত্বের সূচনা ...	— ৫২৭ খ্রীঃ
হজরৎ মহম্মদের জন্ম ...	— ৫৭০ খ্রীঃ
হিজিরাব্দের সূচনা ...	— ৬২২ খ্রীঃ
হজরৎ মহম্মদের দেহত্যাগ ...	— ৬৩২ খ্রীঃ
শার্লামেনের রাজত্বকাল ...	৭৬৮ খ্রীঃ— ৮১৪ খ্রীঃ
পোপ কর্তৃক শার্লামেনের অভিষেক ...	— ৮০০ খ্রীঃ
ধর্মযুদ্ধ—১ম ...	—১০৯৭ খ্রীঃ
ধর্মযুদ্ধ—২য় ...	—১১৪৭ খ্রীঃ
ধর্মযুদ্ধ—৩য় ...	—১১৮৭ খ্রীঃ
ধর্মযুদ্ধ—৪র্থ ...	—১২০১ খ্রীঃ
চীনে তাং বংশের শাসন ...	৬১৮ খ্রীঃ— ৯০৭ খ্রীঃ
হিউয়েন-সাঙের ভারতযাত্রা ...	— ৬২৯ খ্রীঃ
হিউয়েন-সাঙের চীন প্রত্যাবর্তন ...	— ৬৪৫ খ্রীঃ
চীনে সুং বংশের শাসনের সূচনা ...	— ৯৬০ খ্রীঃ
মোঙ্গল জাতির পিকিন অধিকার ...	—১২১৪ খ্রীঃ
রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় ইন্দ্র কর্তৃক কনৌজ লুণ্ঠন	— ৯১৭ খ্রীঃ
বখতিয়ার খলজী কর্তৃক নদীয়া জয় ...	—১২০২ খ্রীঃ
দিল্লীর সুলতানীর সূচনা ...	—১২০৬ খ্রীঃ
সুলতানীর অবসান ...	—১৫২৬ খ্রীঃ
কনস্ট্যান্টিনোপল নগরীর পতন ...	—১৪৫৩ খ্রীঃ